সাহিত্য পরিচয়

Recommended by the West Bengal Board of Secondary Education as a Text Book of Bengali for Class VII, [Vide T. B, No 76/7/TB/44] dt, 24-12-76.

সাহিত্য-পরিচয়

দ্বিতীয় ভাগ

সপ্তম শ্রেণীর পাঠ্য

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষক সমিতি
W. B. T. A.

পরিবেশক
বিদ্যাসাগর পুস্তক মন্দির
৭-বি কলেজ রো, কলিকাতা-৭০০০০৯

পদ্যাংশ

মহানিষ্ক্রমণ

ডাঃ শিশির কুমার বসু

[নেতাজীর গৃহত্যাগের একটি জ্বলন্ত ছবি এই প্রবন্ধে প্রতিফলিত হয়েছে। ডাঃ শিশিরকুমার বসু তাঁর রাঙাকাকাবাবু, নেতাজী সুভাষকে কিভাবে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে গিয়ে গৃহত্যাগে সাহায্যে করেছিলেন এই প্রবন্ধে ডাঃ বসু তাঁর জীবনস্মৃতি হতে তার বর্ণনা দিয়েছেন।]

লাহোর ফোর্ট, ১৯৪৪ সালের নভেম্বর। প্রায় দু'মাস নিঃসঙ্গ ও বিভীষিকাময় কারাবাসের পর আমার সেলের দরজা খোলা হল। পিছমোড়া করে হাতকড়া লাগিয়ে ফোর্টের কর্তৃপক্ষ দিল্লী থেকে আগত দুই উচ্চপদস্থ ইংরেজ অফিসারের সামনে আমাকে হাজির করলেন। তাঁদের মধ্যে একজন আমাকে নানারকম রাজদ্রোহের অপরাধে অভিযুক্ত করে শেষে প্রশ্ন করলেন—আচ্ছা, তোমার কাকার দেশত্যাগের আগে তোমার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ ছিল, তাই না? প্রশ্নটির অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝতে পেরে আমি একটু ঘুরিয়ে জবাব দিলাম, যে কোন ভারতীয় পরিবারে কাকা-ভাইপোর সম্পর্ক সাধারণতঃ ঘনিষ্ঠ হয়েই থাকে। শুনে আমার প্রশ্নকর্তা চাপা গর্জন করে উঠেছিলেন। তারপরেই আমাকে চার্জশীট দেওয়া হল।

নেতাজী যখন ১৯৪০-এর ডিসেম্বরে দেশত্যাগ করার বিরাট সিদ্ধান্ত নিলেন তারই পটভূমিকায় আমার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা একটু অপ্রত্যাশিত ভাবে গড়ে উঠেছিল। যখনকার ঘটনা বলছি সেটা ১৯২৭ সাল, তখন আমরা আমাদের বাবা-মা ও রাঙাকাকাবাবুর সঙ্গে ৩৮।২ এলগিন রোডে ভাড়া বাড়িতে বাস করি। ১৯২৮ সালে বাবা ১নং উডবার্ন পার্কে বাড়ি করলেন। রাঙাকাকাবাবু আমাদের সঙ্গে উডবার্ন পার্কে বাস করতে লাগলেন। ১৯৩২ সালে তিনি গ্রেপ্তার হলেন এবং ১৯৩৩ থেকে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত প্রবাসে বা অন্তরীণে কাটল। বাবা-

মার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ কিন্তু কোনও অবস্থাতেই ছেদ পড়ল না। ১৯৩৭ সালে তিনি মুক্তি পাবার পর তাঁর মা, আমাদের মা-জননী প্রভাবতীর ইচ্ছানুসারে তিনি আমাদের সাবেক বাড়ি ৩৮।২ এলগিন রোডে বাস করতে লাগলেন। দুই বাড়ির—১নং উডবার্ন পার্ক ও ৩৮।২ এলগিন রোড—দূরত্ব খুবই কম, তিন মিনিটের পথ।

১৯৪০-এর জুলাই থেকে ডিসেম্বর মাসে, রাঙাকাকাবাবু যখন শেষবারের মত জেলে ছিলেন, তখন আমি পরিবারের অন্যান্যদের সঙ্গে বেশ কয়েকবার ওঁর সঙ্গে দেখা করতে প্রেসিডেন্সি জেলে গিয়েছি। আমার মনে আছে, উনি আমাকে মেডিকেল কলেজে আমার পড়াশুনা কেমন হচ্ছে খোঁজখবর করতেন, আমাকে প্রায়ই মনে করিয়ে দিতেন যে, হাফ-ডাক্তার হওয়ার চেয়ে হাফ-ইঞ্জিনিয়ার হওয়া ভাল। জেলের কর্তাদের নিয়ে ওঁর যেসব রসিকতা ছিল তা আমরা উপভোগ করতাম। "ব্রিটিশ সাম্রাজ্য আর কতদিন?" বার-বার এই প্রশ্ন করে তিনি জেলের ভারতীয় কর্মচারীদের অপ্রস্তুত করে দিতেন। তারপর তিনি তাঁদের আশ্বাস দিয়ে বলতেন যে, ভারত স্বাধীন হলে তাঁদের চাকরি বহাল থাকবে। কেবল আজ যাঁরা সরকার চালাচ্ছেন আর যাঁরা বন্দী তাঁদের মধ্যে কেবল স্থানবিনিময় হবে।

১৯৪০-এর ২৯ নভেম্বর থেকে রাঙাকাকাবাবু যখন জেলে অনশন শুরু করলেন, তখন সপ্তাহখানেক আমাদের সমস্ত পরিবারে একটা চরম দুশ্চিন্তা দেখা দিল। আমার বাবা তখন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার বিরোধী দলের নেতা। আমার মার কাছে শুনলাম যে, স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন বাবাকে বলেছেন যে, ব্রিটিশ প্রভুরা এ ব্যাপারে খুব কঠোর মনোভাব অবলম্বন করবে। তাতে আমাদের দুশ্চিন্তা গভীরতর হল। কিন্তু ৫ ডিসেম্বর বিকালবেলা আমাদের দুশ্চিন্তার অবসান ঘটিয়ে, এলগিন রোডের বাড়ি থেকে খবর এল যে, রাঙাকাকাবাবু বিনাশর্তে মুক্তি পেয়েছেন ও তাঁকে একটি

অ্যাম্বুল্যান্সে করে বাড়িতে আনা হয়েছে।

···সেদিন ছিল ছুটির দিন। দুপুরে খাওয়ার সময় নেতাজীর নিজস্ব ভৃত্য উডবার্ন পার্কে আমার কাছে এসে আমাকে খবর দিল, রাঙাকাকাবাবু আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। আমি সেদিনই যেন ওঁর সঙ্গে দেখা করি।

রাঙাকাকাবাবু কয়েক মুহূর্ত স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন—"আমার একটা কাজ করতে পারবে ?" আমার যেমন স্বভাব, একটু দুর্বল ও দ্বিধান্বিতভাবে মাথা নাড়লাম। "তুমি কেমন গাড়ি চালাতে পারো ?" "এই একরকম, মোটামুটি ভালই পারি ?"—বললাম। রাঙাকাকাবাবু আর একটু বিশদ হলেন—"কখনো লঙ্ ডিসট্যান্সে গাড়ি চালিয়েছ।" আমি বললাম—"না।" "দেখ একদিন রাত্রে তোমাকে গাড়ি করে আমাকে বেশ কিছুদূরে পৌঁছে দিতে হবে কেউ কিন্তু জানবে না।" আমি নির্লিপ্ত মুখে শুনে যাচ্ছিলাম। "পারবে ?"



আমি আবার মাথা নাড়লাম। এই মাথা নাড়ার মানে হ্যাঁও হতে পারে, আবার অনিশ্চিতও হতে পারে। উনি যেন হ্যাঁ বলে ধরে নিলেন।

রাঙাকাকাবাবু বললেন যে, তিনি গোপনে গৃহত্যাগ করে অজানা পথে পাড়ি দিচ্ছেন, এলগিন রোডের বাড়িতে সেকথা জানবে একমাত্র ইলা ইলা আমার খুড়খুতো বোন, আমার চাইতে বছর দুয়েকের ছোট। রাঙাকাকাবাবু বললেন যে, তিনি ইলাকে পরীক্ষা করে দেখেছেন।

এলগিন রোডের বাড়ি থেকে কিভাবে নিষ্ক্রান্ত হওয়া যায় তাই

হল আমাদের পরিকল্পনার প্রথম ধাপ। এলগিন রোডের বাড়ি থেকে বার হবার নানারকম প্ল্যান প্রস্তাবিত হল ও সেগুলি নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনাও হল। শেষ পর্যন্ত একটা ফাইনাল প্ল্যান দাঁড় করানো হল।

সেই বিশেষ দিনটি শেষ পর্যন্ত এসে পড়ল। তখন রাত্রি সাড়ে আটটা হবে, আমি যাবার জন্য তৈরী হলাম। যেন বিশেষ কিছুই হয়নি এমনি মুখ করে গাড়ি-বারান্দায় এসে সেখানে যে ভৃত্যটি ছিল তাকে বললাম, আমি একটু রিষড়ার বাগানবাড়ীতে বেড়াতে যাচ্ছি। যদি দেরি হয়ে যায় তবে রাত্রিটা ওখানেই কাটাব। রাত্রি ১১টা পর্যন্ত দেখে ওরা যেন আর অপেক্ষা না করে গেট বন্ধ করে দেয়।

অমূল্য সময় বয়ে যাচ্ছে। রাঙাকাকাবাবু চঞ্চল হয়ে উঠছিলেন। ঘরের পর্দার পাশে দাঁড়িয়ে রাঙাকাকাবাবু মহম্মদ জিয়াউদ্দিনের পোশাক পরে নিলেন, ওঁর বেডিংটা গুটিয়ে নেওয়া হল।

রাঙাকাকাবাবু পর্দার এপাশে এসে ইলার কাছ থেকে সস্নেহে বিদায় নিলেন। বললেন, "ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।" ইলাকে বলা হল আমরা চলে যাওয়ার পরে অন্ততঃ আরও এক ঘণ্টা যেন রাঙাকাকাবাবুর ঘরের আলো জ্বলতে থাকে। হোল্ড-অল হাতে অরবিন্দ আগে, তারপর রাঙাকাকাবাবু, পিছনে আমি। তিনজনে করিডরের দেওয়াল ঘেঁষে পা টিপে টিপে পেছনের সিঁড়ি দিয়ে নিচে চললাম। রাঙাকাকাবাবু বসে যাবার পর আমি গাড়িতে উঠলাম ও দরজা সশব্দে বন্ধ করলাম।

এলগিন রোড ও উডবার্ন রোডের মোড়ে তক্তপোশ পেতে সি-আই-ডির লোকেরা তাদের হেড কোয়ার্টার পেতেছিল। আমরা যখন বেরিয়ে গেলাম তারা সম্ভবতঃ কম্বল মুড়ি দিয়ে আরামে ঘুমুচ্ছিল। দুই রাস্তার মোড়ের ঐ পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রটির উদ্দেশ্য ছিল অবশ্য এক ঢিলে দুই পাখি মারা। সেখান থেকে বসু-পরিবারের দুটো বাড়ির উপরই নজর রাখা যেত। আর দরকার পড়লে চট করে যে-কোন বাড়ির সামনে উপস্থিত হওয়া যেত। যাই হোক, তাদের কৌশল

ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল এবং দুই পাখিই তাদের অজান্তে উড়ে গেল।

এলগিন রোড ধরে খানিকটা এগিয়ে বাঁ হাতে জাস্টিস চন্দ্রমাধব রোড ধরলাম এবং ল্যান্সডাউন রোডে পড়লাম। তারপর লোয়ার সার্কুলার রোড ধরে শিয়ালদহ এসে পৌঁছলাম। হ্যারিসন রোড ধরে যেতে যেতে বুঝলাম ভয়ের কোন কারণ নেই। সারা কলকাতা ঘুমুচ্ছে। শুধু হাওড়া ব্রিজের কাছে এসে গোটা-কয়েক ট্যাক্সি ও ঘোড়ার গাড়ি চোখে পড়ল। তারপর গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে শিল্প-এলাকাগুলো পার হবার সময় পথে মাঝে মধ্যে সশস্ত্র পুলিশও চোখে পড়ল। চেনা জায়গাগুলি পার হবার সময় আমরা বলাবলি করতে করতে যাচ্ছিলাম—এই লিলুয়া পার হলাম—বালি, উত্তরপাড়া, কোন্নগর—এবার আমাদের রিষড়া, এই শ্রীরামপুর ইত্যাদি।

বর্ধমান পৌঁছতে প্রায় রাত চারটে হল। ঘুমন্ত শহর ও রেল স্টেশন। আসানসোলের কাছাকাছি যখন এলাম তখন সবে ভোর হয়ে আসছে—চারিদিক কুয়াশায় আচ্ছন্ন। আসানসোল থেকে ধানবাদের পথ খটখটে। সকাল বেলায় রোদ্দুরে ড্রাইভ করতে হল। গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড থেকে রাস্তা যেখানে ধানবাদের দিকে বেঁকে গিয়েছে তার কিছু আগে গোবিন্দপুর নামে গ্রামে চেকপোষ্ট ছিল। আমি তখন ড্রাইভ করে আসছি, দেখতে পেলাম ধীরে ধীরে বাঁশের গেটটা পথ বন্ধ করে নেমে আসছে। আমি গাড়ির গতি কমিয়ে দিলাম। একটি লোক পাশের ছাউনি থেকে পেনসিল আর নোটবই হাতে গাড়ির দিকে এগিয়ে এল। তারপরেই আবার লোকটি সরে গেল, গেটও উপরে উঠে গেল। আমি স্পীড দিয়ে বেরিয়ে গেলাম। ধান-বাদ ছেড়ে বারারির পথ ধরলাম। আমি অধীরভাবে, কতক্ষণে বারারিতে দাদার বাড়ি দেখতে পাবো বলে প্রত্যেকটি মোড় গুনতে লাগলাম। পাশাপাশি ঠিক এক ধরনের দুটি বাড়ি ছিল, একটি আমার দাদার আর অন্যটি এক ইংরেজ অফিসারের। ভুল হলে আর নিস্তার নেই।

তখন সকাল সাড়ে আটটা হবে। কথা ছিল দাদার বাড়ির কিছু দূরে আমি রাঙাকাকাবাবুকে নামিয়ে দেব। আমি বাড়ি থেকে চারশ' গজ মত দূরে গাড়ি একবার দাঁড় করালাম। রাঙাকাকাবাবু নেমে পড়লেন। সেই ১৭ই জানুয়ারি সারাদিন ধরে দাদার বাড়িতে যে স্টেজ অ্যাকটিং করে গেলাম সে একটা আলাদা করে বলার মত গল্প।

আবার যাত্রা শুরু। শীতের সন্ধ্যা যখন গাঢ় হয়ে এল, রাঙা-কাকাবাবু সব ভৃত্যদের সামনে বারান্দায় দাঁড়িয়ে বেশ লোকদেখানো-ভাবে আমাদের কাছে বিদায় নিলেন। আমরা তিনজন একটু পরে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। পথে মোটেই আলো নেই। রাঙা-কাকাবাবু টর্চের সাহায্যে এগোচ্ছিলেন। কিছুদূর গিয়েই তাঁর ছদ্ম-বেশী চেহারা চোখে পড়ল। আমরা তাঁকে গাড়িতে তুলে নিলাম।

দাদা রাস্তা দেখিয়ে দিলেন আর আমি গোমো স্টেশনের দিকে গাড়ি চালিয়ে দিলাম। দিল্লী-কালকা মেল মধ্যরাত্রির পর গোমো স্টশনে আসে। রাঙাকাকাবাবু এই গাড়িই ধরবেন। আমাদের যেতে হবে মাত্র ত্রিশ মাইল। আমরা ধীরে-সুস্থে চলছিলাম। গোমো স্টেশনের কাছাকাছি রাস্তাটা খুব খারাপ। স্টেশন চত্বরে যখন পৌছ-লাম তখন ট্রেন আসার সময় প্রায় হয়েছে। একজন ঘুমন্ত চেহারার কুলি এসে মালগুলো তুলে নিল।

"আমি চললাম, তোমরা ফিরে যাও" এই ছিল তাঁর বিদায়মুহূর্তের শেষ কথা। আমি যেমন যেন নির্বাক ও নিষ্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম, প্রণাম করার কথাও মনে এল ন। রাত্রের গোমো স্টেশনের নির্জন ওভারব্রীজ দিয়ে রাঙাকাকাবাবু তাঁর স্বভাবসিদ্ধ দৃপ্ত অথচ দৃঢ় ভঙ্গিতে হেঁটে চলে যাচ্ছেন, আগে চলেছে কুলি, তার মাথায় মালপত্র, চিরদিনের মত এই ছবিটা আমার মনে মুদ্রিত হয়ে রইল।

পরদিন শনিবার ১৯৪১-এর ১৮ জানুয়ারি বিকেল চারটা নাগাদ আমি ১নং উডবার্ন পার্কে গাড়ি নিয়ে ঢুকলাম।

এর পরের দু-মাস প্রতিদিন আমাদের উৎকণ্ঠা ও চাপা উত্তেজনায় কাটল। শেষ পর্যন্ত আমাদের উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার শেষ হল ৩১ মার্চ-এ।

ভগৎরাম বলে একজন এসে বললেন যে, তিনিই পেশোয়ার থেকে কাবুল পর্যন্ত রাঙাকাকাবাবুর সাথী ছিলেন এবং কাবুল থেকে মস্কোর পথে রওনা করিয়ে দিয়ে তিনি ফিরে এসেছেন। সেইদিন রাঙাকাকাবাবুর মস্কো পৌঁছবার কথা। ভগৎরাম আমার বাবাকে রাঙাকাকাবাবুর খবর দিলেন এবং তিনটি লেখা বার করলেন। বাবা আমাকে লেখাগুলির দায়িত্ব নিতে বলে ভগৎরামকে আর আমাদের বাড়িতে না আসতে পরামর্শ দিলেন। লেখাগুলির মধ্যে প্রথমটি ছিল বাবার উদ্দেশ্যে পেনসিলে লেখা ব্যক্তিগত চিঠি। দ্বিতীয়টি ছিল কালিকলমে ইংরেজীতে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে লেখা—"Message to my countrymen from somewhere in Europe." এবং এটিতে তারিখ দেওয়া ছিল ১৭ই মার্চ ১৯৪১। তৃতীয়টি ছিল একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ—Forward Bloc—Its Justification: পেন্সিলে লেখা এই প্রবন্ধটি পরে প্রকাশিত হয়েছে এবং মূলটি নেতাজী রিসার্চ ব্যুরোর সংগ্রহশালায় আছে।

এর পরের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল কলকাতায় জাপানী কনস্যুলেটের মাধ্যমে রাঙাকাকাবাবুর সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ। রাঙাকাকাবাবু জার্মানী থেকে জাপানে সংবাদ পাঠিয়েছেন, সেই সংবাদ কলকাতার জাপানী কনস্যুলেটে এসে পৌঁচেছে, ওরা কোডের অর্থ উদ্ধার করে সংবাদ আমাদের দিতে এসেছেন।

১৯৪৩ সালটা এইভাবে চলল। বছরের শেষের দিকে রাঙাকাকাবাবুর বার্তাবহ আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। এই ভদ্রলোকের নাম টি. কে. রাও—মাদ্রাজের অধিবাসী। ইনি ছিলেন ইণ্ডিয়ান আর্মিতে। ইনি উত্তর আফ্রিকার টোব্রুকের বিখ্যাত লড়াইয়ে রোমেলের বাহিনীর হাতে ধরা পড়েন। ইউরোপে স্থানান্তরিত হবার পর

নেতাজীর ডাকে আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দেন। রাওয়ের সঙ্গে আমার যোগাযোগ চলল। পুলিশ ইতিমধ্যে ধরে নিয়েছে যে, নেতাজীর অন্তর্ধানের সঙ্গে আমার যোগসাজস ছিল।

১৯৪৪ সালের অক্টোবরে কলেজে যাওয়ার পথে পুলিশ আমাকে ঘিরে ফেলল এবং গাড়িতে তুলে লর্ড সিন্‌হা রোডে নিয়ে গেল। তারপর দিল্লীর লালকেল্লার আণ্ডারগ্রাউণ্ড সেলে আমাকে ঠেলে দেওয়া হল। দিল্লী থেকে লাহোর। লাহোর ফোর্টের বার নম্বর সেলে আমাকে রাখা হল।

নিয়মিত প্রশ্নোত্তর আরম্ভ হবার আগে ঝানু স্পেশাল সুপারিনটেনডেন্ট মাঝে মাঝে খাঁচার বাইরে থেকে নানাভাবে আমার উপর মনস্তাত্ত্বিক চাপ সৃষ্টি করতেন। বলতেন, "দেখ, এখানে তো কেবল অতি বিপজ্জনক ব্যক্তিদের আনা হয়—যারা গোপনে রাজদ্রোহাত্মক কাজে লিপ্ত, এক কথায় যারা রিভলিউশনারি, তুমি তো দেখছি নিতান্তই ভদ্রলোক, তুমি এখানে এসেছো কেন?" তারপর বলতেন, "লাহোর ফোর্টে যারা আসে তারা বড় একটা কেউ ঘরে ফেরে না।"

আমারও কেমন মনে হল লাহোর ফোর্টে নিগৃহীত হবার গৌরব লাভ করে আমি ধন্য। বহুযুগ আগে এক রাত্রে রাজকুমার সিদ্ধার্থ গৃহত্যাগ করে গিয়েছিলেন সিদ্ধিলাভের আশায়। তিনি ইতিহাসের পাতায় ফিরে এলেন গৌতম-বুদ্ধরূপে। আধুনিককালে আর এক রাত্রে অন্য এক সিদ্ধিলাভের আশায় গৃহত্যাগ করলেন সুভাষচন্দ্র। ইতিহাসের পাতায় তিনি প্রত্যাগত নেতাজীরূপে। তাঁর সেই ঐতিহাসিক গৃহত্যাগে আমার যে অতি সামান্য ভূমিকা তা আমার জীবনকে সার্থক করেছে।

অনুশীলনী

১। সুভাষচন্দ্র বসুর অন্তর্ধান সম্বন্ধে যা জান সংক্ষেপে লেখ।

২। ভগৎরাম ও টি, কে, রাও কে ছিলেন এবং কিভাবে তাঁরা সুভাষচন্দ্রকে সাহায্য করেছিলেন ?

৩। ব্যাখ্যা লেখ :—

(ক) বহু যুগ আগে ... নেতাজী রূপে।

৪। অর্থ লেখ—প্রবাস, অন্তরীণ, সাবেক, দ্বিধান্বিত, উৎকণ্ঠা। স্বরচিত বাক্যে শব্দ পাঁচটিকে ব্যবহার করো।

৫। সন্ধিবিচ্ছেদ করো :—সিদ্ধার্থ, ইচ্ছানুসারে, পুঙ্খানুপুঙ্খ, যোগাযোগ, অন্তর্নিহিত, বিপজ্জনক।

৬। পদপরিবর্তন কর :—সার্থক, অভিযুক্ত, সাবেক, অন্তর্ধান, পরিধান, রসিকতা, গ্রেপ্তার, ঘনিষ্ঠ, বলিষ্ঠ, পরিকল্পনা, প্রত্যাশিত, প্রত্যাগত।

অতিরিক্ত অনুশীলনী

৭। (ক) মহানিষ্ক্রমণ একটি স্মৃতিচারণ—কাহার স্মৃতিচারণ ?

(খ) লেখকের সঙ্গে নিষ্ক্রমণকারীর কি সম্পর্ক ছিল। নিষ্ক্রমণকারীই বা কে ?

(গ) লেখক কোথা হইতে নিষ্ক্রমণকারীকে লইয়া বাহির হন ? কোন্ পর্যন্তই বা তাহার সঙ্গে ছিলেন ?

(ঘ) লেখককে কোথাকার জেলে রাখা হয়। সেখানে কেই বা তাহাকে নানা বিষয়ে প্রশ্ন করেন ? কেনই বা ঐসব প্রশ্ন করা হয় ?

(ঙ) 'মহানিষ্ক্রমণ' কথাটির' অর্থ কি ?

(৮) শূন্যস্থান পূর্ণ কর :—

(ক) ১৯৩৪ — তিনি — — পর—মা, আমাদের — প্রভাবতীর — তিনি আমাদের — বাড়ি এলগিন রোডে — — লাগলেন।

(খ) ...যেদিন — — দিন। — খাওয়ার — নেতাজীর — ভৃত্য উড্‌বার্ন — আমার — এসে আমাকে — দিল, — আমাকে পাঠিয়েছেন। আমি – দিনই — ওঁর — দেখা করি।

(গ) — সময় — যাচ্ছে। — চঞ্চল — উঠছিলেন। ঘরের

ওপাশে — রাঙাকাকাবাবু মহম্মদ — পোশাক — নিলেন, বেডিংটা — নেওয়া — ।

৯। (ক) বিপরীত শব্দ লিখ :—

নিষ্ক্রমণ, প্রশ্ন, অপ্রত্যাশিত, অপ্রস্তুত, বন্দী, নির্লিপ্ত, মঙ্গল, উপস্থিত, অজান্তে ।

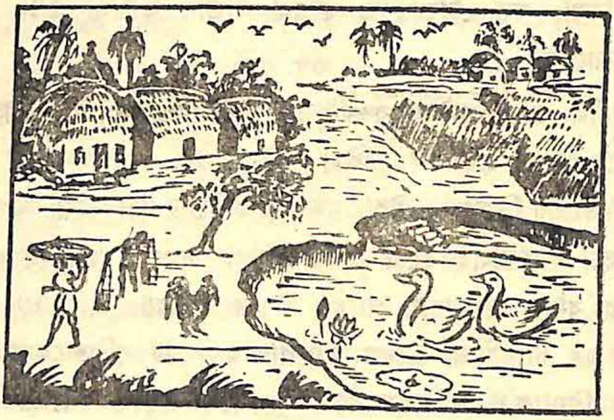
(খ) প্রতিশব্দ লিখ :—

নিঃসঙ্গ, বিভীষিকাময়, অভিযুক্ত, পটভূমি অপ্রত্যাশিতভাবে, উপভোগ, নির্লিপ্ত, পরিকল্পনা, উদ্দেশ্য, স্বভাবসিদ্ধ ।

(গ) ইংরাজি প্রতিশব্দ লিখ :—

রাজদ্রোহ, পটভূমিকা, অপরাধ, ব্যাপক, লিপিকা, অন্তরীণ, দলীয়-ব্যবস্থাপক-সভা, স্বরাষ্ট্র, রোগীদের হাসপাতালে লইবার গাড়ি, দূরে, চূড়ান্ত পরিকল্পনা, পর্যবেক্ষণ-কেন্দ্র ।

গঙ্গার শোভা
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



[এখানে লেখক গঙ্গা ও গঙ্গার ঘাটগুলির তীরস্থ গাছপালা, ভাঙা দেবমন্দির ও লোকালয় প্রভৃতির স্বাভাবিক বর্ণনা করিয়াছেন। এই রচনায় কল্পনার রঙ না মিশাইয়া দৃশ্যগুলির সৌন্দর্য ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে।]

শান্তিপুরের দক্ষিণ হইতে আরম্ভ করিয়া গঙ্গাতীরের যেমন শোভা, এমন আর কোথায় আছে! গাছপালা, ছায়া, কুটীর—নয়নের আনন্দ অবিরল সারি সারি দুইধারে বরাবর চলিয়াছে—কোথাও বিরাম নাই। কোথাও বা তটভূমি সবুজ ঘাসে আচ্ছন্ন হইয়া গঙ্গার কোলে আসিয়া গড়াইয়া পড়িয়াছে, কোথাও বা একেবারে নদীর জল পর্যন্ত ঘন গাছপালা লতাজালে জড়িত হইয়া ঝুঁকিয়া আসিয়াছে—জলের উপর তাহাদের ছায়া অবিরাম দুলিতেছে; কতকগুলি সূর্য-কিরণ সেই ছায়ার মাঝে মাঝে ঝিক্‌মিক্ করিতেছে, আর বাকী কত-গুলি গাছপালায় কম্পমান কচি মসৃণ সবুজ পাতার উপরে চিক্ চিক্ করিয়া উঠিতেছে। একটা নৌকা তাহার কাছাকাছি গাছের গুঁড়ির সঙ্গে বাঁধা রহিয়াছে এবং সেই ছায়ার নীচে অবিশ্রাম জলের কুলকুল শব্দে মৃদু দোলা খাইয়া, বড় আরামের ঘুম ঘুমাইতেছে। তাহার আর একপাশে বড় বড় গাছের ঘনচ্ছায়ার মধ্য দিয়া ভাঙা বাঁকা একটা পদচিহ্নের পথ জল পর্যন্ত নামিয়া আসিয়াছে। সেই পথ দিয়া গ্রামের

মেয়েরা কলসী কাঁখে করিয়া জল লইতে নামিতেছে, ছেলেরা কাদার উপর পড়িয়া, জল ছোঁড়াছুঁড়ি করিয়া সাঁতার কাটিয়া ভারি মাতা-মাতি করিতেছে।

প্রাচীন ভাঙা ঘাটগুলির কী শোভা! মানুষেরা যে এ ঘাট বাঁধিয়াছে তাহা একরকম ভুলিয়া যাইতে হয়, এও যেন গাছপালার মত গঙ্গাতীরের নিজস্ব। ইহার বড় বড় ফাটলের মধ্য দিয়া অশ্বত্থগাছ উঠিয়াছে, ধাপগুলির ইঁটের ফাঁক দিয়া ঘাস গজাইতেছে—বহু বৎসরের বর্ষার জলধারায় গায়ের উপরে শেওলা পড়িতেছে—এবং তাহার রঙ চারিদিকে শ্যামল গাছপালার রঙের সহিত কেমন সহজে মিশিয়া গিয়াছে। মানুষের কাজ ফুরাইলে প্রকৃতি নিজের হাতে সেটা সংশোধন করিয়া দিয়াছেন, তূলিকা ধরিয়া এখানে নিজের রঙ লাগাইয়া দিয়াছেন।

গ্রামের যে সকল ছেলে-মেয়ে নাহিতে বা জল লইতে আসে, তাহাদের সকলেরই সঙ্গে ইহার যেন একটা কিছু সম্পর্ক পাতানো আছে—কেহ ইহার নাতনী, কেহ ইহার মা-মাসী! তাহাদের দাদা-মশায় ও দিদিমারা যখন এতটুকু ছিল, তখন ইহারই ধাপে বসিয়া খেলা করিয়াছে, বর্ষার দিনে পিছলিয়া পড়িয়া গিয়াছে। আর সেই যাত্রাওয়ালা বিখ্যাত গায়ক অন্ধ শ্রীনিবাস সন্ধ্যাবেলায় ইহার পৈঠার উপর বসিয়া বেহালা বাজাইয়া গৌরী রাগিণীতে 'গেল দিন' গাহিত ও গাঁয়ের দুই-চারিজন লোক আশে-পাশে জমা হইত, তাহার কথা আজ আর কাহারো মনে নাই।

গঙ্গাতীরের ভগ্ন দেবালয়গুলির যেন বিশেষ কী মাহাত্ম্য আছে। তাহার মধ্যে আর দেবপ্রতিমা নাই। কিন্তু সে নিজেই জটাজুট-বিলম্বিত অতি পুরাতন ঋষির মত অতিশয় ভক্তিভাজন ও পবিত্র হইয়া উঠিয়াছে।

এক-এক জায়গায় লোকালয়—সেখানে জেলেদের নৌকা সারি সারি বাঁধা রহিয়াছে। কতকগুলি জলে, কতকগুলি ডাঙায় তোলা,

কতকগুলিকে তীরে উপুড় করিয়া মেরামত করা হইতেছে; তাহাদের পাঁজরা দেখা যাইতেছে।

কুঁড়েঘরগুলি কিছু ঘন ঘন কাছাকাছি। কোন কোনটা বাঁকা-চোরা বেড়া দেওয়া—দুই-চারিটি গরু চরিতেছে, গ্রামের দুই-একটা শীর্ণ কুকুর নিষ্কর্মার মত গঙ্গার ধারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; একটা উলঙ্গ ছেলে মুখের মধ্যে আঙুল পুরিয়া বেগুনের ক্ষেতের সম্মুখে দাঁড়াইয়া অবাক্ হইয়া আমাদের জাহাজের দিকে চাহিয়া আছে। হাঁড়ি ভাসা-ইয়া লাঠি বাঁধা ছোট ছোট জাল লইয়া জেলের ছেলেরা ধারে ধারে চিংড়িমাছ ধরিয়া বেড়াইতেছে।

সম্মুখে তীরে বটগাছের জালবদ্ধ শিকড়ের নীচ হইতে নদীর স্রোত মাটি ক্ষয় করিয়া লইয়া গিয়াছে ও সেই শিকড়গুলির মধ্যে একটি নিভৃত আশ্রয় নির্মিত হইয়াছে। একটি বুড়ী তাহার দুই-চারিটি হাঁড়ি-কুড়ি ও একটি চট লইয়া তাহারই মধ্যে বাস করে।

আবার আর এক দিক দিয়া চড়ার উপর বহুদূর ধরিয়া কাশবন। শরৎকালে যখন ফুল ফুটিয়া উঠে, তখন বায়ুর প্রত্যেক হিল্লোলে হাসির সমুদ্রে যেন তরঙ্গ উঠিতে থাকে।

যে কারণেই হউক, গঙ্গার ধারে ইঁটের পাঁজাগুলিও আমার দেখিতে বেশ ভাল লাগে;—তাহাদের আশেপাশে গাছপালা থাকে না—চারি-দিকে পোড়ো জায়গা এবড়ো-খেবড়ো—ইতস্তত কতকগুলো ইঁট খসিয়া পড়িয়াছে, অনেকগুলি ঝামা ছড়ানো—স্থানে স্থানে মাটি কাটা। অনুর্বরতা ও বন্ধুরতার মধ্যে পাঁজাগুলো কেমন হতভাগ্যের মত দাঁড়া-ইয়া থাকে।

গাছের শ্রেণীর মধ্য হইতে শিবের দ্বাদশ মন্দির দেখা যাইতেছে; সম্মুখে ঘাট। নহবৎখানায় নহবৎ বাজিতেছে। তাহার ঠিক পাশেই খেয়াঘাট; কাঁচা ঘাট, ধাপে ধাপে তালগাছের গুঁড়ি দিয়া বাঁধানো। আরো দক্ষিণে কুমারদের বাড়ি, চাল হইতে কুমড়া ঝুলিতেছে। একটি প্রৌঢ়া কুটীরের দেওয়ালে গোবর দিতেছে—প্রাঙ্গণ পরিষ্কার, তকতক

করিতেছে—কেবল এক প্রান্তে মাচার উপর লাউগাছ লতাইয়া উঠিতেছে, আর এক দিকে তুলসীতলা।

সূর্যাস্তের নিস্তরঙ্গ গঙ্গায় নৌকা ভাসাইয়া দিয়া গঙ্গার পশ্চিম পারের শোভা যে দেখে নাই, সে বাংলার সৌন্দর্য দেখে নাই বলিলেও হয়। এই পবিত্র শান্তিপূর্ণ-অনুপম সৌন্দর্যচ্ছবির বর্ণনা সম্ভব হয় না। * * * ক্রমে সন্ধ্যার আলো মিলাইয়া যায়, বনের মধ্যে এদিকে ওদিকে এক-একটি করিয়া প্রদীপ জ্বলিয়া উঠে, সহসা দক্ষিণের দিক হইতে একটা বাতাস উঠিতে থাকে—পাতা ঝরঝর করিয়া কাঁপিয়া উঠে, অন্ধকারে বেগবতী নদী বহিয়া যায়, কূলের উপরে অবিশ্রাম তরঙ্গ-আঘাতে ছলছল করিয়া শব্দ হইতে থাকে—আর কিছু ভাল দেখা যায় না, শোনা যায় না। কেবল ঝিঁঝিঁ পোকার শব্দ উঠে আর জোনাকিগুলি অন্ধকারে জ্বলিতে নিভিতে থাকে। আরো রাত্রি হয়।

অনুশীলনী

১। এই রচনায় বর্ণিত গঙ্গাতীরের শোভা বর্ণনা কর।

২। এই রচনা পাঠের অভিজ্ঞতা হইতে তোমাদের বাড়ির নিকট যে নদী বা কোন দ্রষ্টব্য স্থান আছে তাহার সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা কর।

৩। নিম্নলিখিত বাক্যগুলির ব্যাখ্যা লিখ :—

(ক) একটা … ঘুম ঘুমাইতেছে।

(খ) কিন্তু সে নিজেই জটাজুটবিলম্বিত … পবিত্র হইয়া উঠিয়াছে।

(গ) সূর্যাস্তের নিস্তরঙ্গ … সম্ভব হয় না।

৪। নিম্নলিখিত ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলিকে স্বরচিত বাক্যে ব্যবহার কর—ঝিকমিক, চিকচিক, ঝর ঝর, ছলছল, কুলকুল।

৫। সমাসগুলিকে ভাঙিয়া দেখাও—পদচিহ্ন, কাশবন, খেয়াঘাট, লাঠি-বাঁধা, জালবদ্ধ।

অতিরিক্ত অনুশীলনী

৬। (ক) "কোথাও বিরাম নাই"—কিসের বিরাম? কোন্ প্রসঙ্গে এই উক্তি? উক্তিটি কাহার? বিরাম কথাটার বিপরীত কথা কি?

(খ) "মানুষের কাজ ফুরাইলে প্রকৃতি নিজের হাতে সেটা সংশোধন করিয়া দিয়াছেন, তুলিকা ধরিয়া এখানে নিজের রঙ লাগাইয়া দিয়াছেন।"

উক্তিটি কোথা হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে? কাহার বর্ণনা প্রসঙ্গে লেখক এই মন্তব্য করিয়াছেন? প্রকৃতি কিসের সংশোধন করিয়াছেন আর কিভাবেই বা সংশোধন করিয়াছেন?

(গ) ...অন্ধ শ্রীনিবাস সন্ধ্যাবেলায় ইহার পৈঠার উপর বসিয়া বেহালা বাজাইয়া গৌরী রাগিণীতে "গেল দিন" গাহিত।

'ইহার'—কাহার? 'গৌরী রাগিণী' কি? শ্রীনিবাসের গানের শ্রোতারা ছিল কাহারা? শ্রীনিবাসই বা কে ছিল?

(ঘ) "কেহ ইহার নাতনী" "কেহ ইহার মা-মাসী"।

ইহার কাহার? নাতনী ও মা-মাসী কাহাদের উদ্দেশ্যে বলা হইয়াছে? ঐরূপ সম্পর্কই বা কেন পাতান হইয়াছে?

(ঙ) "যে কারণেই হউক গঙ্গার ধারের ইঁটের পাঁজাগুলিও আমার দেখিতে বেশ ভাল লাগে।"

'আমার' কাহার? কোথাকার গঙ্গার কথা বলা হইয়াছে? ইঁটের পাঁজাগুলির শোভা কেন লেখকের ভাল লাগে?

মেজদা

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়



[বাংলার প্রখ্যাত কথা-শিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের প্রথম পর্ব হইতে মেজদা গল্পটি সংকলিত হইয়াছে। শরৎচন্দ্রের বাল্যজীবনের কোন এক অভিজ্ঞতার উপর এই কাহিনী রচিত।]

সে দিনটা আমার খুব মনে পড়ে। সারাদিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টিপাত হইয়াও শেষ হয় নাই। শ্রাবণের সমস্ত আকাশটা ঘনমেঘে সমাচ্ছন্ন হইয়া আছে, এবং সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইতে না হইতেই চারিদিক্ গাঢ় অন্ধকারে ছাইয়া গিয়াছে। সকাল সকাল খাইয়া লইয়া আমরা কয়ভাই নিত্য প্রথামত বাহিরের বৈঠকখানায় ঢালাবিছানার উপর রেড়ির তেলের সেজ জ্বালাইয়া বই খুলিয়া বসিয়া গিয়াছি। বাহিরের বারান্দায় এক-দিকে পিসেমশায় ক্যাম্বিসের খাটের উপর শুইয়া তাঁহার সান্ধ্য তন্দ্রাটুকু উপভোগ করিতেছেন, এবং অন্যদিকে বসিয়া বৃদ্ধ রামকমল ভট্চায আফিং খাইয়া অন্ধকারে চোখ বুজিয়া, থেলো হুঁকায় ধূমপান করি-তেছিলেন। দেউড়ীতে হিন্দুস্থানী-পেয়াদাদের তুলসীদাসী সুর শুনা যাইতেছে, এবং ভিতরে আমরা তিন ভাই, মেজদার কঠোর তত্ত্বাবধানে নিঃশব্দে বিদ্যাভ্যাস করিতেছি। ছোড়দা, যতীনদা ও আমি তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ি, এবং গম্ভীরপ্রকৃতি মেজদা বার-দুই এনট্রান্স

ফেল করিবার পর গভীর মনোযোগের সহিত তৃতীয়বারের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। তাঁহার প্রচণ্ড শাসনে একমুহূর্ত কাহারো সময় নষ্ট করিবার জো ছিল না। আমাদের পড়ার সময় ছিল সাড়ে সাত হইতে নয়টা। এই সময়টুকুর মধ্যে কথাবার্তা কহিয়া মেজদার 'পাশের' পড়ার বিঘ্ন না করি, এই জন্য তিনি নিজে প্রত্যহ পড়িতে বসিয়াই কাঁচি দিয়া কাগজ কাটিয়া বিশ-ত্রিশখানি টিকিটের মত করিতেন। তাহার কোনটাতে লেখা থাকিত 'বাইরে', কোনটাতে 'থুথুফেলা,' কোনটাতে 'নাকঝাড়া'। টিকিট লইয়া মেজদার সুমুখে ধরিয়ে দিতাম। মেজদা তাহাতে স্বাক্ষর করিয়া লিখিয়া দিলেন—হুঁ—আটটা তেত্রিশ মিনিট হইতে আটটা সাড়ে চৌত্রিশ মিনিট পর্যন্ত অর্থাৎ এই সময়টুকুর জন্য সে নাক ঝাড়িতে পারে। ছুটি পাইয়া যতীনদা টিকিট-হাতে উঠিয়া যাইতেই ছোড়দা 'থুথুফেলা' টিকিট পেশ করিলেন। মেজদা 'না' লিখিয়া দিলেন। কাজেই ছোড়দা মুখ ভারি করিয়া মিনিট-দুই বসিয়া 'তেষ্টা পাওয়া' আর্জি দাখিল করিয়া দিলেন। এবার মঞ্জুর হইল। মেজদা সই করিয়া লিখিলেন—হুঁ—আটটা একচল্লিশ মিনিট হইতে আটটা সাতচল্লিশ মিনিট পর্যন্ত। পরওয়ানা লইয়া ছোড়দা হাসিমুখে বাহির হইতেই যতীনদা ফিরিয়া আসিয়া হাতের টিকিট দাখিল করিলেন। মেজদা ঘড়ি দেখিয়া সময় মিলাইয়া একটা খাতা বাহির করিয়া সেই টিকিট গঁদ দিয়া আঁটিয়া রাখিলেন। সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম তাঁহার হাতের কাছেই মজুত থাকিত। সপ্তাহ-পরে এই সব টিকিটের সময় ধরিয়া কৈফিয়ত তলব করা হইত।

এইরূপে মেজদার অত্যন্ত সতর্কতায় এবং সুশৃঙ্খলায় আমাদের এবং তাঁহার নিজের কাহারও এতটুকু সময় নষ্ট হইতে পাইত না। প্রত্যহ এই দেড়ঘন্টা কাল অতিশয় বিদ্যাভাস করিয়া রাত্রি নয়টার সময় আমরা যখন বাড়ির ভিতর শুইতে আসিতাম, তখন মা সরস্বতী নিশ্চয়ই ঘরের চৌকাঠ পর্যন্ত আমাদিগকে আগাইয়া দিয়া যাইতেন ;

এবং পরদিন ইস্কুলে ক্লাসের মধ্যে যে সকল সম্মান-সৌভাগ্য লাভ করিয়া ঘরে ফিরিতাম, সে ত আপনারা বুঝিতেই পারিতেছেন। কিন্তু মেজদার দুর্ভাগ্য, তাঁহার নির্বোধ পরীক্ষকগুলা তাঁহাকে কোনদিন চিনিতেই পারিল না, নিজের এবং পরের বিদ্যাশিক্ষার প্রতি এরূপ প্রবল অনুরাগ, সময়ের মূল্য সম্বন্ধে এমন সূক্ষ্ম দায়িত্ববোধ থাকা সত্ত্বেও, বারংবার ফেল করাইয়াই দিতে লাগিল। ইহাই অদৃষ্টের অন্ধ বিচার! যাক্ – এখন আর সে দুঃখ জানাইয়া কি হইবে।

সে রাত্রেও ঘরের বাহিরে ঐ জমাট অন্ধকার এবং বারান্দায় তন্দ্রাভিভূত সেই দুটো বুড়ো। ভিতরে মৃদু দীপালোকের সম্মুখে গভীর-অধ্যয়ন-রত আমরা চারিটি প্রাণী।

ছোড়দা ফিরিয়া আসায় তৃষ্ণায় আমার একেবারে বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। কাজেই টিকিট পেশ করিয়া, উন্মুখ হইয়া রহিলাম। মেজদা তাঁহার সেই টিকিট-আঁটা খাতার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন—তৃষ্ণা-পাওয়াটা আমার আইনসঙ্গত কি না, অর্থাৎ কাল-পরশু কি পরিমাণে জল খাইয়াছিলাম।

অকস্মাৎ আমার ঠিক পিঠের কাছে একটা 'হুম' শব্দ ; এবং সঙ্গে সঙ্গে ছোড়দা ও যতীনদার সমবেত আর্তকণ্ঠের গগনভেদী রৈ রৈ চীৎকার—ওরে বাবা রে, খেয়ে ফেল্লে রে! কিসে ইহাদিগকে খাইয়া ফেলিল, আমি ঘাড় ফিরাইয়া দেখিবার পূর্বেই, মেজদা মুখ তুলিয়া একটা বিকট শব্দ করিয়া বিদ্যুৎবেগে তাঁহার দুই পা সম্মুখে ছড়াইয়া দিয়া সেজ উল্টাইয়া দিলেন। তখন সেই অন্ধকারের মধ্যে যেন দক্ষযজ্ঞ বাধিয়া গেল। মেজদার ছিল ফিটের ব্যামো। তিনি সেই যে 'অোঁ্যা অোঁ্যা করিয়া প্রদীপ উল্টাইয়া চিৎ হইয়া পড়িলেন, আর খাড়া হইলেন না।

ঠেলাঠেলি করিয়া বাহির হইতেই দেখি, পিসেমশাই তাঁর দুই ছেলেকে বগলে চাপিয়া ধরিয়া তাহাদের অপেক্ষাও তেজে চেঁচাইয়া

বাড়ি ফাটাইয়া ফেলিতেছেন। এ যেন তিন বাপ-ব্যাটার কে কত খানি হাঁ করিতে পারে তারই লড়াই চলিতেছে।

এই সুযোগে একটা চোর নাকি ছুটিয়া পলাইতেছিল, দেউড়ীর সিপাহীরা তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়াছে। পিসেমশাই প্রচণ্ড চীৎকারে হুকুম দিতেছেন—আউর মারো—শালাকো মার ডালো—ইত্যাদি।

মুহূর্তকাল মধ্যে আলোয়, চাকর-বাকরে ও পাশের লোকজনে উঠান পরিপূর্ণ হইয়া গেল। দারোয়ানরা চোরকে মারিতে মারিতে আধমরা করিয়া টানিয়া আলোর সম্মুখে ধাক্কা দিয়ে ফেলিয়া দিল। তখন চোরের মুখ দেখিয়া বাড়িসুদ্ধ লোকের মুখ শুকাইয়া গেল। আরে, এ যে ভট্‌চায্যিমশাই!

তখন কেহ বা জল, কেহ বা পাখার বাতাস, কেহ বা তাঁহার চোখে-মুখে হাত বুলাইয়া দেয়। ওদিকে ঘরের ভিতরে মেজদাকে লইয়া সেই ব্যাপার।

পাখার বাতাস ও জলের ঝাপটা খাইয়া রামকমল প্রকৃতিস্থ হইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। সবাই প্রশ্ন করিতে লাগিল, আপনি অমন করে ছুটছিলেন কেন? ভট্‌চায্যিমশাই কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, বাবা, বাঘ নয়, সে একটা মস্ত ভালুক—লাফ মেরে বৈঠকখানা থেকে বেরিয়ে এলো।

ছোড়দা ও যতীনদা বারংবার কহিতে লাগিলেন, ভালুক নয় বাবা, একটা নেকড়ে বাঘ। হুম করে ল্যাজ গুটিয়ে পা-পোশের উপর বসেছিল।

মেজদার চৈতন্য হইলে তিনি নিমীলিতচক্ষে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সংক্ষেপে কহিলেন, 'দি রয়েল বেঙ্গল টাইগার'।

কিন্তু কোথায় সে? মেজদার 'দি রয়েল বেঙ্গল টাইগার'ই হোক, আর রামকমলের 'মস্ত ভালুক'ই হোক, সে আসিলই বা কিরূপে, গেলই বা কোথায়? এতগুলি লোক যখন দেখিয়াছে, তখন সে একটা কিছু বটেই!

তখন কেহ বা বিশ্বাস করিল, কেহ বা করিল না। কিন্তু সবাই লণ্ঠন লইয়া ভয়চকিত নেত্রে চারিদিক খুঁজিতে লাগিল।

অকস্মাৎ পালোয়ান কিশোরী সিং 'উহ্ বয়ঠা' বলিয়াই একলাফে একেবারে বারান্দার উপর। তারপর সেও এক ঠেলাঠেলি-কাণ্ড। এতগুলা লোক সবাই একসঙ্গে বারান্দায় উঠিতে চায়, কাহারো মুহূর্ত বিলম্ব সয় না। উঠানের একপ্রান্তে একটা ডালিমগাছ ছিল, দেখা গেল, তাহারই ঝোপের মধ্যে বসিয়া একটা বৃহৎ জানোয়ার। বাঘের মতই বটে। চক্ষের পলকে বারান্দা খালি হইয়া বৈঠকখানা ভরিয়া গেল—জনপ্রাণী আর সেখানে নাই। সেই ঘরের ভিড়ের মধ্যে হইতে পিসেমশায়ের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর আসিতে লাগিল—সড়কি লাও—বন্দুক লাও। আমাদের পাশের বাড়ির গগনবাবুদের একটা মুঙ্গেরী গাদা বন্দুক ছিল; লক্ষ্য সেই অস্ত্রটার উপর। 'লাও' ত বটে, কিন্তু আনে কে? ডালিমগাছটা যে দরজার কাছেই; এবং তাহারই মধ্যে যে বাঘ বসিয়া! হিন্দুস্থানীরা সাড়া দেয় না—তামাসা দেখিতে যাহারা বাড়ি ঢুকিয়াছিল, তাহারাও নিস্তব্ধ।

এমনি বিপদের সময় হঠাৎ কোথা হইতে ইন্দ্র আসিয়া উপস্থিত। সে বোধ করি সুমুখের রাস্তা দিয়া চলিয়াছিল, হাঙ্গামা শুনিয়া বাড়ি ঢুকিয়াছে। নিমেষে শতকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল—ওরে বাঘ! বাঘ! পালিয়ে আয় রে ছোঁড়া, পালিয়ে আয়!

প্রথমটা সে থতমত খাইয়া ছুটিয়া আসিয়া ভিতরে ঢুকিল। কিন্তু ক্ষণকাল পরেই ব্যাপারটা শুনিয়া লইয়া একা নির্ভয়ে উঠানে নামিয়া গিয়া লণ্ঠন তুলিয়া বাঘ দেখিতে লাগিল।

দোতলার জানালা হইতে মেয়েরা রুদ্ধনিশ্বাসে এই ডাকাত ছেলেটির পানে চাহিয়া দুর্গানাম জপিতে লাগিল। পিসিমা ত ভয়ে কাঁদিয়াই ফেলিলেন। নীচে ভিড়ের মধ্যে গাদাগাদি দাঁড়াইয়া হিন্দুস্থানী-সিপাহীরা তাহাকে সাহস দিতে লাগিল এবং এক-একটা অস্ত্র পাইলেই নামিয়া আসে, এমন আভাসও দিল।

বেশ করিয়া দেখিয়া ইন্দ্র কহিল, দ্বারিকাবাবু, এ বাঘ নয় বোধ হয়। তাহার কথাটা শেষ হইতে না হইতেই সেই রয়েল বেঙ্গল টাইগার দুই থাবা জোড়া করিয়া মানুষের গলায় কাঁদিয়া উঠিল। পরিষ্কার বাঙ্গালা করিয়া কহিল, না বাবুমশাই, না। আমি বাঘ-ভালুক নই—ছিনাথ বউরূপী।

ইন্দ্র হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। ভট্‌চায্যিমশাই খড়ম হাতে সর্বাগ্রে ছুটিয়া আসিলেন—"হারামজাদা! তুমি ভয় দেখাবার জায়গা পাও না?'

পিসেমশাই মহাক্রোধে হুকুম দিলেন, "শালাকো কান পাকড়কে লাও।"

অনুশীলনী

১। "মেয়েরা রুদ্ধনিশ্বাসে এই ডাকাত ছেলেটির পানে চাহিয়া দুর্গানাম জপিতে লাগিল। এই ডাকাত ছেলেটি কে? রুদ্ধনিশ্বাসে কেন? ঘটনাটি বর্ণনা কর।

২। এই প্রবন্ধে বর্ণিত মেজদা, পিসেমশায়, ছিনাথ বউরূপী ও ইন্দ্রনাথের পরিচয় দাও।

৩। ব্যাখ্যা লিখ :—

(ক) তাঁহার প্রচণ্ড শাসনে...জো ছিল না। (খ) মেজদার চৈতন্য হইলে—কহিলেন 'দি রয়েল বেঙ্গল টাইগার'। (গ) ছোড়দা ফিয়িয়া...ফাটিয়া যাইতে লাগিল। (ঘ) 'লাও' ত বটে, কিন্তু আনে কে?

৪। নিম্নলিখিত শব্দের সমাস লিখ :—

সাজ-সরঞ্জাম, সম্মান-সৌভাগ্য, তন্দ্রাভিভূত, দীপালোক, ঘনমেঘ।

অতিরিক্ত অনুশীলনী

৫। (ক) 'মেজদা—গল্পটি কোন্ উপন্যাস হইতে গৃহীত? উপন্যাসখানি কাহার লেখা? মেজদার আখ্যানভাগে কাহার অভিজ্ঞতার কথা লেখা আছে? এই অখ্যানভাগে মেজদা ভিন্ন আর যাহাদের কথা বলা হইয়াছে তাহাদের দুই একজনের বিষয়ে যাহা বলা হইয়াছে বল।

(খ) রবীন্দ্রনাথকে বলা হয় 'বিশ্বকবি', বঙ্কিমচন্দ্রকে বলা হয় 'সাহিত্য সম্রাট'। ঐরূপ শরৎচন্দ্রকে কি বলা হয়।

৬। ভিতরে আমরা তিন ভাই—আমরা কাহারা? তিন ভাই কে কে? তাঁহারা কি করিতেছিলেন? ভাই তিনটি কোন্ কোন্ শ্রেণীতে পড়ে? 'মেজদা' কিরূপ প্রকৃতির? তিনিই বা কোন্ শ্রেণীর ছাত্র।

৭। "তাহার কোনটাতে লেখা থাকিত"...
'তাহার' কাহার? তাহাতে কি লেখা থাকিত? কেই বা ঐসব লিখিয়া ছিলেন? কেনই বা লেখা হইয়াছিল? কি জন্যই বা ঐগুলির ব্যবহার হইত?

৮। "তাহার নির্বোধ পরীক্ষকগুলা তাঁহাকে কোনদিনই চিনিতে পারিল না।"

'তাহার'—কাহার? চিনিতে পারিল না—কথাটা বলার তাৎপর্য কি? পরীক্ষকদের কেনই বা নির্বোধ বলা হইল? উক্ত মন্তব্যটি কাহার? ঐ মন্তব্যটি সম্বন্ধে তোমার মতামত কি?

৯। "সড়কি লাও—বন্দুক লাও"—কাহার উক্তি? বক্তার সঙ্গে লেখকের কি সম্পর্ক? সড়কি বা বন্দুক কেন আনিতে বলা হইল?

১০। ডানধার হইতে আনিয়া শূন্যস্থানে বসাও :—

(ক) — হিন্দুস্থানী — — সুর — যাইতেছে। (খ) তাঁহার — শাসনে— কাহারো নষ্ট করিবার — ছিল না। (গ) — সাজ-সরঞ্জাম — হাতের — থাকিত। (ঘ) থাক্, তখন — দুখ — কি?	আর, তাহার, মজুত, হইবে, কাছেই, জানাইয়া, সমস্ত, তুলসীদাসী, প্রচণ্ড, সময়, দেউড়ীতে, শুনালো, পিয়াদাদের, একমুহূর্ত, সুর।

যোশী মঠ

রানী চন্দ

এবারে পাহাড়ের উলটো দিক্ দিয়ে নামতে হবে। পায়ে চলার সরু সরু দাগ পাহাড়ের গা বেয়ে শতধারার মতো নেমে গেছে নিচে। কোন্‌টা ধরে নামি? কিছুটা গিয়েই ধাঁধা লাগে। একটা ছেড়ে আর একটা ধরি। শেষে এক পাহাড়ি মেয়ে, মাটিতে গর্ত খুঁড়ে জল ভরছিল কলসিতে, তার নির্দেশে একটা পথ ধরে চোখ বুজে ছুটতে থাকি। তু'পাশে ক্ষেতে; জঙ্গল, বড়ো বড়ো কাঁটাগাছ। আশপাশ দেখা যায় না। চলতে চলতে বসতি বাড়িঘরের আঙিনা দিয়ে পথ ক'রে নিয়ে চলি। গৃহস্থের মাচানের লতা থেকে কাঁকড়ি কিনে খাই, তেষ্টা মেটে। পাহাড়ের বুকে, কোলে, বির্বান্ধব বসতি। কয়েকটি ঘর নিয়ে গাঁ। এক গাঁয়ের বিপদে আর এক গাঁয়ে সহজে সাড়া যায় না। দিন মাস বছর যুগ কাটে এদের একই-ভাবে; আমরা শহরের প্রাণী। দেহে মনে প্লেন মোটরের গতি। এদের প্রতি অকারণ মমতায় বুক ভরে উঠে। ছোট্ট ঘর সংসার ক্ষেত-খামারের ফসলদানা নিয়ে। তাই-ই রোদে শুকোয়, ঝাড়ে পোঁছে, বছরের আহার সযত্নে সঞ্চয় করে রাখে। পাহাড়িবৌ জল বয়ে আনে নিচ হতে মাথায় কলসি চাপিয়ে। পাহাড় ভাঙতে চাপ পড়ে শ্বাসে। কচি কচি কাওন জোয়ারের দানা ছিঁড়ে চিবোতে চিবোতে পথে চলে, গলা ভেজায়। বুড়ো শ্বশুর দাওয়ায় পাতা কার্পেটে ব'সে ধর্মগ্রন্থ পড়ে। পাশে শুয়ে বুড়ি শাশুড়ি পাঠ শোনে, আর পাখি তাড়ায় রোদে মেলে দেওয়া পাকা গম-ধানের উপর থেকে।

চালে শুকোয় শসার কুচি, পাকা কুমড়োর টুকরো, বিন, আলু লঙ্কা, লাউ। নিরু বললেন, "আমসি-লঙ্কা শুকিয়ে রাখে জানি লোকে, কিন্তু শসা-কুমড়ো শুকোয়, এ কখনো দেখি নি।"

বহুক্ষণ বাদে এতক্ষণে এসে পড়ি ধসে যাওয়া পথের অন্য প্রান্তে।

মাথার উপর সূর্যের প্রচণ্ড তাপ। আসল পথ পেয়ে গিয়েছি এবারে। জিরিয়ে জিরিয়ে পা ফেলি।

তুপুরে ঝাড়কুলা চটিতে এসে বিশ্রাম নিলেন। নিরু বললে, "এই প্রথম মনে হচ্ছে, পা তুটো যেন আমাতে নেই। পথে বারে বারে বিগড়ে বসছিল, কোনোমতে এদের টেনে নিয়ে এসেছি।"

চটিতে পৌঁছেই নিরু শুয়ে পড়ল। শুয়েই ঘুম। জাগল সেই বড়দির ডাকে। বড়দি বললেন, "রান্না হয়ে গেছে, ওঠো খাবে যে এবার।"

সুনীল আকাশ। মোড়ের মাথায় ঝাউগাছটার [illegible]রে পাতাগুলি নড়ে আকাশের গায়ে। সূর্যের আলো রূপোর [illegible]ঠি ছোঁয়ায় নড়ার তালে তালে।

বহু নিচে অলকনন্দা। মনে হয় স্থির অচঞ্চল ; যেন তুলি ভরা টেরাভাইটি রঙের একটি স্নিগ্ধ আঁচড়।

পাহাড়ের গা বেয়ে গোলাপি ভাঁটার ক্ষেত, যেন কালো পাথরে বধূবরণের তুধ-আলতা গুলে সাজিয়ে রেখেছে থরে থরে। যেন পার্বতীর রাঙা চেলির গাঁটছড়া বাঁধা পড়ে শিবের রুক্ষ বল্কলে।

তিন মাইল দূরে যোশীমঠ। ভালো রাস্তা। হেলতে তুলতে অতি সহজে চলে এলাম। এক দোকানী নিজ বাগান থেকে তুলে এনে দিল হলুদ ডালিয়া, লাল গোলাপ, সাদা চামেলি। তার সাধ যোশীমঠের মন্দিরে এ-ফুলের সঙ্গে তার পূজাও গ্রহণ করবেন দেবতা।

বড়দি বললেন, "এখনই যাবে, না ফিরতি পথে ?" এক দক্ষিণী সাধু তাঁকে বলে দিয়েছিলেন, "মহাত্মা দেখতে চাও তো যোশীমঠের উপরে জ্যোতির্মঠ, সেখানে সীতারামবাবা আছেন, তাঁকে দেখো গিয়ে।"

নিরুর মনটা খারাপ হয়ে আছে। এ পথে যেতে আসতে যখনই যার সঙ্গে দেখা হয়েছে, সকলে হাসিমুখে কথা কয়েছে, কঠিন পথে স্নেহদৃষ্টি ঢেলেছে, ক্লান্তিতে উৎসাহ দিয়েছে। সে এক সহজ, অন্তরঙ্গ আত্মীয়তা।

খানিক আগে আজই বিকেলে আসছিলাম যখন, দেখি, গেরুয়া রঙের বাক্স বেডিং নিয়ে কুলিরা নামছে। গেরুয়া হলেও শৌখিন মালপত্র। উৎসাহে এগিয়ে গেল নিরু, না জানি কারা হবেন। সুন্দর বেশভূষায় সজ্জিত দণ্ডধারী এক সাধু দেখা দিলেন। কুলিরা বললে, জ্যোতির্মঠের মোহান্ত বাবা নিচে নামছেন। নিরু একপাশে স'রে দাঁড়িয়ে সসম্ভ্রমে পথ ছেড়ে দিল। মোহান্ত বাবা পাশ কাটিয়ে যাবার সময়ে নিরুকে ব'লে গেলেন, "শখ করে কষ্ট করতে এ পথে আসা কেন ?" মুখে যেন তাঁর প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপরেখা। নিরু ভেবে পায় না' ভিতরে ভিতরে সে যে রাগের তাপ অনুভব করছে, তা কি নিজের দোষে, না মোহান্তের ঐ অযাচিত বিদ্রূপে ?

বললে, "দাঁড়াও বড়দি, মন স্থির করতে পারছি না। আগে চা খেয়ে নেই।"

কয়েক মিনিটের বিশ্রামে আর গরম চায়ের কল্যাণে শরীরে নতুন করে উৎসাহ জাগে। নিরু উঠে দোকান থেকে কোঁচড় ভরে আপেল ন্যাসপাতি কিনে আনে। বলে, "পরে হবে বলে কোনো কিছু ফেলে রাখতে নেই। চলো এখনই যাই, দেখে আসি সীতারাম বাবাকে। ফিরতি পথে যদি আর না-ই আসা হয়।"

খোঁচাটা সে দিল বড়দিকে। থেকে থেকেই বড়দি বলেন, যদি সত্যই ভালোবাস বড়দিকে, তবে এবার আমাকে রেখে এসো বদরী-নারায়ণের পায়েই, ফিরিয়ে এনো না।' নিরু বলেছিল, 'এ আর কঠিন কথা কি, যে ভাবে আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করেছ, সুসময় এল বলে। বয়ে আনবার ক্ষমতা নেই, অলকনন্দার বরফ-জলেই ভাসিয়ে দিয়ে আসব।"

সাধুসন্তের কাছে খালি হাতে যেতে নেই। ফল দেখে বড়দি খুব খুশি। এত বড় আপেল সচরাচর দেখি না আমরা। সড়ক ছেড়ে পাহাড়ের গা বেয়ে, ধানক্ষেত গমক্ষেত মাড়িয়ে নানা ঝরনা পার হয়ে উপরে উঠি।

জ্যোতির্মঠ হল শঙ্করাচার্য্যের প্রতিষ্ঠিত চার মঠের এক মঠ। মঠের একটু নিচে ছোটো মন্দিরে জ্যোতির্লিঙ্গ মহাদেব, স্বয়ম্ভু শিব। মন্দিরের মাথা ছেয়ে বিরাট একটি তুঁতগাছ শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে সুশীতল করে রেখেছে জায়গাটিকে। গাছের ঘের একশো-দশ ফুট। এই গাছটিতে নাকি ফল হয় নি। পূজারি বললেন, "ফল হলেই তো ফল পাড়তে লোক গাছে উঠবে। নিচে শিব। শিবের মাথার উপরে উঠবে কেউ, সে তো হয় না। তাই ভগবানেরই এই বিধি।"

জন-কোলাহল থেকে দূরে, নির্জনে, পাহাড়ের আশ্রয়ে গাছে ঢাকা শীতল ছায়ায় ঘেরা এই জায়গাটুকুতে যেন তপোবনের আবহাওয়া। তুঁতগাছের নিচে একটা মসৃণ কালো পাথর। যেন পাতা বিছানাটি। নিরু তাতে হাত বুলোয় আর বলে, "লোভ হয় নাকি এখানে। মনে হচ্ছে, এ যেন আমার কোন পূর্বজন্মের মুনিপিতার আশ্রম।"

সীতারামবাবা ঝরনায় গিয়েছিলেন, ফিরলেন। পর্বতের মতোই বলিষ্ঠ উন্নত দেহ। কৌপীন পরিহিত। মাথায় দেড়মানুষ লম্বা, দীর্ঘ জটাজালের প্রান্ত বাম বাহুতে জড়ানো আমাদের দেখে তাঁর প্রফুল্ল আনন হাস্যোদ্ভাসিত হয়ে উঠল। আদর করে কুটিরের ভিতর নিয়ে বসালেন। বালকসুলভ সারল্য তাঁর মুখে, তাঁর ভঙ্গিতে বললেন, "ভিতরে জায়গা কম, তা হোক, এসো, ধুনির পাশেই সবাই বসি।" কুঠরির মেঝেজোড়া ধুনি এক পাশে। সীতারামবাবা খুব খুশি। বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, ম্যায় ভি বাংলা জানে। আসামে কামাখ্যামে অনেক বরষ থেকেছি।" মহা উৎসাহে তিনি বাংলা ব'লে যান। তিনি সিপাহী বিদ্রোহ দেখেছেন; বলেন, "এই তো সে দিনের কথা। এর মধ্যে আবার কত যুদ্ধ বিগ্রহ হয়ে গেল। শুনেছি নিজের দেশেও ভাইয়ে-ভাইয়ে কাটাকাটি হল।"

আড়াই বছর বয়সে সংসার ছেড়েছেন সীতারামবাবা। সেই থেকে সাধুসঙ্গে আছেন। গুরু দেহ রাখবার পর ভারতের নানা স্থান

ঘুরে এখন কুড়ি-বাইশ বছর যাবত এখানেই আছেন। কোথাও যান না, ভিক্ষাও করেন না। বলেন, "দাতা প্রভু, তিনি যখন যা প্রয়োজন মিলিয়ে দেন। সেই দাতা হলেন রাম। তাঁর উপরেই নির্ভর করে থাকো। কিছু না সকালে বিকালে দু'বার একটু তাঁর নাম করো, তাঁকে ডেকো, গৃহস্থ মানুষের এতেই সব হবে।" হেসে বললেন, "আমিও তাই। সন্ন্যাসী নই, ভগবানের দাসপুত্র।"

সকলকেই তিনি 'সীতারাম' বলে সম্বোধন করেন, তাই সবাই তাঁর নাম দিয়েছে 'সীতারাম'। গল্পে জমে গিয়ে উঠতে ভুলে যাই। সন্ধ্যে হয়ে আসে দেখে তিনিই তাড়া দিলেন। বললেন, "আমার আর কী আছে, কী দেব? এই বিভূতি নিয়ে যাও, ঘরে ফিরে বালবাচ্চাদের কপালে মাখিয়ে দিয়ো।" ব'লে ধুনির ভস্ম তুলে আমাদের হাতে হাতে দিলেন। বড়দির শখ সীতারামবাবার একটা ফটো তোলেন। খুশি হয়ে তিনি বাইরের আলোয় এসে দাঁড়ালেন।

মনে খুব খুশি। আমাদের ফিরতি পথে কলকল করতে করতে নামি। সীতারামবাবাকে বড় ভাল লেগে গিয়েছে। দীর্ঘ এক শতাব্দীকাল তিনি ভজন গেয়ে কাটিয়ে দিলেন। দেহের বাঁধন এখনও অটুট। আর কী নম্রতা!

বড়দি বললেন, "ও কি করছ নিরু? মুঠো মুঠো ধানশীষ ছিঁড়ছ কেন অমন করে ক্ষেত থেকে?"

নিরু বললে, "সীতারামবাবার সংসার থেকে কিছু অন্ন সংগ্রহ করে নিচ্ছি।"

কেদারের যেমন উখীমঠ, বদরীনাথের তেমনি যোশীমঠ। শীতকালের ছ'মাস এখানে তাঁর পূজো হয়। নিরু আজ আর বার হল না। বড়দিরা গিয়ে মন্দির দেখে এলেন, আরতির আগুন স্পর্শ করলেন।

ব্রজবাসী ব্রাহ্মণ আছেন এই চটিতে। নিরুকে বললেন "ঐ যে দু'পাশে দুই পাহাড় দেখছ, ভাগবতে ওর বর্ণনা আছে। ঐ হল

'নারায়ণ' পর্বত। এই দুই পাহাড়ের কোল দিয়ে যে-পথ কাল সেই পথেই আমরা বদরীনারায়ণে যাব।"

পরের দিন ভোর-ভোর সময়ে যোশীমঠ ত্যাগ করি। দু' মাইল একটানা উতরাই। তারপর বিষ্ণুপ্রয়াগ। বিষ্ণুগঙ্গা আর অলকনন্দার সঙ্গম। যোশীমঠ হ'ল বিষ্ণুগঙ্গার পারে। এবারে বিষ্ণুগঙ্গাকে ছেড়ে অলকনন্দাকে বাঁয়ে রেখে তীরের পথ ধরি ও'পাশে উঁচু পাহাড়। বেলা হয়েছে, তবু চাপা পথে আলো এসে পড়েনি এখনও। ঠাণ্ডা পথ, শীত-শীত হাওয়া, কোথাও ঢালু কোথাও চড়াই। সামনে পিছনে নীল আকাশ, পাথরের গায়ে হালকা কয়েকটা পাইনগাছ। আমরা এক সার মানুষ পর্বতের কোলে কোলে পিঁপড়ের মতো হেঁটে চলেছি। এ এক আলাদা জগৎ।

অনুশীলনী

১। যোশীমঠে যাত্রাপথের যে প্রকৃতিক বর্ণনা এই প্রবন্ধে দেওয়া হয়েছে তা সংক্ষেপে লেখ।

২। জ্যোতির্মঠের প্রতিষ্টাতা কে? ঐ মঠের সম্বন্ধে যা জান লেখ।

৩। সীতারামবাবা কে? তাঁর সংসার কোথায় কি ভাবে চলে? সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৪। ব্যাখ্যা লেখ:

হেসে বললেন, "আমিও তাই। সন্ন্যাসী নই, ভগবানের দাস মাত্র।"

৫। টীকা লেখ:

সিপাহী বিদ্রোহ, ভাগবত।

অতিরিক্ত অনুশীলনী

৬। (ক) যোশীমঠ কোন্ শ্রেণীর সাহিত্য? এইরূপ আর কোন লেখার নাম জান কি? (পথে-প্রবাসে, হিমালয় ভ্রমণ ইত্যাদি) 'যোশীমঠ' কাহার লেখা? (খ) জ্যোতির্মঠ' কোথায়? উক্ত মঠ কে প্রতিষ্ঠা করেন?

তিনি আর কয়টি মঠ প্রতিষ্ঠা করেন? জ্যোতির্মঠের নিচে মন্দিরে কোন্ দেবতা আছেন? এই মন্দিরের মাথায় কি আছে? তাহার বৈশিষ্ট্য কি?

৭। "...তার নির্দেশে একটা পথ ধরে চোখ বুজে ছুটতে থাকি।"—তার—কার? কে ছুটতে থাকে? 'চোখ বুজে' কথাটা বলার সার্থকতা কি?

৮। (ক) সীতারাম বাবা কে? তিনি কোথায় থাকেন? কে, কাহাকে তাঁহার কথা বলেন।"দক্ষিনী সাধু" কথাটার অর্থ কি? সীতারামবাবার সঙ্গে লেখিকাদের কোথায় দেখা হয়? তখন তিনি লেখিকাদের কি বলিয়াছিলেন?

(খ) "সন্ন্যাসী নাই. ভগবানের দাসমাত্র"—কাহার উক্তি? সন্ন্যাসী না হইলে তিনি কে? তাঁহার মতে মাতা কে? তাঁহাকে ডাকিলে কি ফল লাভ হয়?

৯। "দীর্ঘ এক শতাব্দীকাল তিনি ভজন গেয়ে কাটিয়ে দিলেন"—তিনি কে ছিলেন? ভজন কি? ঐ উক্তিটি কাহার? বক্তার কাছে ঐ ভজন গাইয়েটিকে কেমন লাগিয়াছিল? আর কেনই বা এরূপ লগিয়াছিল?

পল্লী-সংস্কার

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ

[ভারত কৃষিপ্রধান দেশ। দেশের অধিকাংশ লোকই পল্লীঅঞ্চলে বাস করে। দেশবন্ধু পল্লীবাসীর উন্নতির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই প্রবন্ধে লেখক দেশের কৃষি, কুটিরশিল্প ও অন্যান্য ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির জন্য নানা প্রকার উপদেশ দিয়াছেন।]

বাংলাদেশে এমন গ্রাম নাই যেখানে অন্ততঃপক্ষে শতকরা পঁচাত্তর জন ঋণগ্রস্ত নহে। এমন অনেক গ্রাম আছে যেখানে শতকরা ১০০ জন ঋণদায়ে পীড়িত। সুতরাং এদেশে কৃষিকাজের উৎপন্ন হইতে চাষী জীবন ধারণ ত করিতেই পারে না বরং যাহা কিছু অর্জন করে তাহারও একটা অংশ মহাজনের ঘরে গিয়া পড়ে।

আমরা কথায় বলিয়া থাকি অভাবে স্বভাব নষ্ট; চাষীদের অবস্থা ভাল করিয়া ভাবিতে গেলে, এই ঘোর দারিদ্র্যনিবন্ধন দুই দিক দিয়া আমাদের স্বভাব নষ্ট হইতেছে। একদিক অর্থাভাবে আমাদের মনুষ্যত্বের যে আদর্শ তাহা সাধন করিতে না পারিয়া দিন দিন শক্তিহীন হইয়া পড়িতেছি, আবার অন্যদিক দিয়া দেখিতে গেলে সেই একই কারণে চুরি-ডাকাতি ও অন্যান্য প্রকারের দুষ্কার্য বাড়িতেছে। সুতরাং যে দিক দিয়াই দেখা যায় আমাদের এই ঘোর দারিদ্র্যকে দূর করিতে হইবে।

আমাদের এক হাতে এই দেশের স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে হইবে, অন্য হাতে তাহারই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এই যে দারিদ্র্য তাহা ঘুচাইতে হইবে। স্বাস্থ্যের উন্নতি করিতে হইলে চাষীদিগকে সেই সম্বন্ধে শিক্ষাদান করিতে হইবে, নূতন পুষ্করণী খনন করিতে হইবে, পুরাতন পুকুরগুলি সংস্কার করিতে ইহবে, বন-জঙ্গল পরিষ্কার করিতে হইবে এবং চাষীরা যাহাতে আরও পরিস্কার পরিচ্ছন্নভাবে জীবনযাপন করিতে পারে তাহার উপায় করিয়া দিতে হইবে। অর্থগমের ব্যবস্থা

করিতে হইলে চাষীকে অল্প সুদে তাহার আবশ্যকীয় টাকা ধার দিবার জন্য, গ্রামে গ্রামবাসীদের উপকারের জন্য, তাহাদের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া ছোট ছোট ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

আমাদের দেশে কি এমন তূলা আজও উৎপন্ন হয় না, চাষ করিলে কি সেটুকু ফসল ফলে না, যাহাতে আমাদের মোটা কাপড় লজ্জা-নিবারণের জন্য তৈয়ারি হইতে পারে? এখনও ত আমরা উপবীতের সুতা নিজেরাই তেয়ারি করি, সে সুতা যেমন মোটা হয় তেমনি সরুও হয়। যেভাবে পূর্বে আমরা কাপড় ও সুতা তৈয়ারী করিতাম, চরকায় আবার কেন তেমনিভাবে সুতা কাটিয়া কাপড় তৈয়ারির ব্যবস্থা করি না?

প্রথম কথা আমাদের বিলাস বর্জন। এই বিলাস বর্জন সংযমের সাধনা করিতে হইবে এবং আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে ভদ্রলোকের ঘরে যাহার আরম্ভ হইবে, অল্পদিনের মধ্যেই তাহা চাষার ঘরে প্রসারিত হইয়া পড়িবে।

তৎপর দেখিতে হইবে যে, আমাদের দেশের কোথায় কোথায় কি কি পণ্যদ্রব্য প্রস্তুত হইত; সেই সব ভাল করিয়া অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতে হইবে এবং সেই-সব পণ্য-শিল্পের আবার নূতন করিয়া প্রতিষ্টা করিতে হইবে। এই সকল চেষ্টার যে ভিত্তি, অর্থাৎ পল্লীগ্রামের ও শহরের স্বাস্থ্য, তাহার পুনরুদ্ধার করিতে হইবে। পল্লীগ্রামের অস্বাস্থ্যের প্রধান কারণ বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাব। যেমন করিয়াই হউক, আমাদের সেই পানীয় জলের সুব্যবস্থা করিয়া দিতে হইবে।

আমাদের চাষীদের লেখাপড়া শেখান উচিত। কিন্তু তাহাদের আবার কারখানার মধ্যে জুড়িয়া দিও না। আমাদের চাষীরা সহজ জ্ঞানে ও অনেক দিনের সাধনার বলে সভ্য। তাহাদের 'ক' 'খ' কি 'এ' 'বি' 'সি' শিখান এমন একটা কঠিন ব্যাপার নয়। আমরা ইচ্ছা করিলে তাহা অতি সহজেই সম্পন্ন করিতে পারি। ইংরাজী শিক্ষায় তাহাদিগকে খুব পণ্ডিত করিয়া তোলার আবশ্যকতা নাই। আমাদের

গ্রামে গ্রামে যে-সব পুরাতন প্রথা ছিল সেই-সব পুরাতন জিনিস আবার চালাইয়া দাও। তাহার সঙ্গে সঙ্গে দুই-একটা মোড়লের বাড়ি দুই-একটি নৈশবিদ্যালয় স্থাপন কর।

আমাদের কার্য সুসম্পন্ন করিতে হইলে সমস্ত বাংলা দেশটাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাগ করিয়া লইতে হইবে। সে বিভাগ নূতন করিয়া করিতে হইবে না। গভর্নমেণ্ট আমাদের দেশটাকে যে জেলায় জেলায় বিভক্ত করিয়াছেন তাহাতেই আমাদের কাজ চলিবে। প্রত্যেক জেলাতেই একই রকম নিয়ম, একই রকম প্রণালীতে কাজ করিতে হইবে। প্রত্যেক জেলাতেই অনেকগুলি গ্রাম আছে। জনসংখ্যা ও কার্যের সুবিধানুসারে কতকগুলি গ্রাম লইয়া এক-একটি পল্লী বা গ্রাম্য-সমাজ প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। তাহারা সকলে মিলিয়া পাঁচজন পঞ্চায়েত নির্বাচন করিবে। এই পঞ্চায়েতের উপর গ্রামসমূহের সকল কার্য, সকল শুভাশুভের ভার অর্পিত হইবে। তাঁহারা গ্রামের পথ-ঘাটের ব্যবস্থা করিবেন, এই সকল গ্রামে আমাদের সে-সব যাত্রা, কথকতা ইত্যাদি প্রচলিত ছিল সেই-সব আবার চালাতে চেষ্টা করিবেন; যে নৈশবিদ্যালয়ের কথা বলা হইয়াছে তাহা তাঁহারাই স্থাপন ও পরিচালনা করিবেন। চাষীকে কৃষিকার্য সম্বন্ধে যে সকল শিক্ষা দেওয়া অবশ্যক তাহার ব্যবস্থা তাঁহারাই করিবেন। তাঁহারাই আবশ্যকীয় নূতন পুষ্করিণী খনন, পুরাতন পুষ্করিণী সংস্কার আদি করিবেন। গ্রামগুলি যাহাতে পরিষ্কার থাকে তাহা দেখিবেন, চাষীরা যাহাতে বারমাস পরিশ্রম করিয়া নিজেদের আবশ্যকীয় দ্রব্যসকল প্রস্তুত করিতে পারে তৎসম্বন্ধে তাহাদিগকে শিক্ষা দিয়া এই সব কার্যের উপায় করিয়া দিবেন। এই পল্লীসমাজ প্রতি পল্লীতে একটি করিয়া সাধারণ ধান্যাগার স্থাপন করিবেন। প্রত্যেক গৃহস্থ চাষীমাত্রেই সেই ধান্যাগারে তাহাদের ক্ষেতের ফসল হইতে কিছু কিছু করিয়া ধান্য দিবে। পল্লীসমাজ সেই ধান্যাগার যাহাতে সুরক্ষিত থাকে তাহার ব্যবস্থা করিবেন। যখন অজন্মা বা বীজের অভাব হইবে, তখন

পল্লীসমাজ চাষীদের প্রয়োজনমত হিসাব করিয়া ধান দিবেন, পরে আবার ফসল হইলে তাহারা সেই পরিমাণ ধান্যাগারে পূরণ করিয়া দিবে।

এই সব গ্রামবাসীদের মধ্যে কোন কলহ অথবা ছোট ছোট মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে উক্ত পঞ্চায়েতই তাহার নিষ্পত্তি করিয়া



দিবেন এবং ফৌজদারী ও জেলার আদালতে তদন্ত-বিবরণ পাঠাইয়া দিবেন। তাঁহাদের সেই তদন্ত-বিবরণই সব আদালতে নালিশ বা আর্জি বলিয়া গৃহীত হইবে। অন্য কোন নালিশ বা আর্জি আদালতে গৃহীত হইবে না।

এই পল্লীসমাজের বা পঞ্চায়েতের আরও কয়েকটি কাজ থাকিবে। যথা—

(১) কুটীর শিল্পের যাহাতে উন্নতি ও প্রসার হয়, তাহার উদ্ভাবন করিয়া কার্যে পরিণত করিবেন।

(২) জেলার মধ্যে কোন্ কোন্ দ্রব্যের ব্যবসা-বাণিজ্য চলিতে পারে, তাহা নির্ধারণ করিয়া উপযুক্ত লোক নির্বাচন করতঃ ছোট-খাটো ব্যবসা পরিচালনা করিবেন।

(৩) জেলার কৃষিকার্য, কুটীর-শিল্প ও অন্যান্য ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য অর্থের সুবিধার জন্য একটি ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করিবেন। এই ব্যাঙ্কের শাখা প্রত্যেক পল্লীসমাজ-কেন্দ্রেই একটি করিয়া থাকিবে। এই ব্যাঙ্ক যাহাতে ভাল করিয়া চলিতে পারে, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। চাষীরা মহাজনদের নিকট হইতে দাদন না লইয়া এই ব্যাঙ্ক হইতে টাকা লইবে এবং যাহাতে তাহারা খুব কম সুদে টাকা ধার পাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই ব্যাঙ্ক যাহাতে জেলার সকলের সমবেত চেষ্টায় পরিচালিত হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৪) জেলা ও পল্লীসমাজের সকল কার্য নির্বাহের জন্য ট্যাক্স বসাইয়া আবশ্যক টাকা উঠাইবার ক্ষমতা পল্লীসমাজের বা পঞ্চায়েতের হস্তে নিহিত থাকিবে।

(৫) গ্রামে গ্রামে আবশ্যকীয় চৌকিদার নিযুক্ত থাকিবে।

উল্লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী কার্য করিলে পল্লীর উন্নতি ও সমৃদ্ধি হইতে বাধ্য।

অনুশীলনী

১। এই প্রবন্ধে বর্ণিত "পল্লী-সংস্কার" বিষয়ে একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লিখ।

২। পল্লী-সংস্কারের জন্য কি কি বিষয়ে আমাদের নজর দেওয়া দরকার?

৩। ব্যাখ্যা লিখ :—

(ক) আমার কথায়·····স্বভাব নষ্ট হইতেছে।

(খ) আমাদের মনে রাখিতে······প্রচারিত হইয়া পড়িবে।

৪। অর্থ লিখ :—মহাজন (দুই অর্থে), উপবীত, পণ্যদ্রব্য, পঞ্চায়েত, তদন্ত, নিষ্পত্তি, আর্জি, দাদন।

৫। সন্ধিবিচ্ছেদ কর :—পুনরুদ্ধার, ধান্যগার।

৬। সমাস ভাঙিয়া দেখাও :—ঋণগ্রস্থ, ঋণদায়, শিক্ষাদান।

অতিরিক্ত অনুশীলনী

৭। "সুতরাং যে দিক দিয়াই দেখা যায় আমাদের এই ঘোর দারিদ্র্যকে দূর করিতেই হইবে।"

—কাহার উক্তি? কোথা হইতে এই উদ্ধৃতি লওয়া হইয়াছে? আমাদের বলিতে লেখক কাহাদের বুঝাইয়াছেন? লেখক কোন্ কোন্ দিকের কথা বলিয়াছেন?

৮। "ইংরাজী শিক্ষায় তাহাদিগকে খুব পণ্ডিত করিয়া তোলার আবশ্যকতা নাই।"

—উক্তিটি কাহার? তাহাদিগকে বহিতে লেখক কাহাদের উদ্দিষ্ট করিয়াছেন? লেখকের ঐ উক্তির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য কি? তুমি কি ঐ মন্তব্য সমর্থন কর? যদি না কর কেন কর না তাহা বল।

৯। "এই পল্লীসমাজ প্রতি পল্লীতে একটি করিয়া সাধারণ ধান্যাগার স্থাপন করিবে।"

—এই উপদেশ কাহার? ধান্যাগার কিভাবে গড়িয়া উঠিবে? সে সম্বন্ধে লেখকের বক্তব্য কি? ঐরূপ ধান্যাগার গঠনের সার্থকতাই বা কোথায়?

১০। শূন্যস্থানে সঠিক পদ বসাও :—

(ক) আবার — দিক দিয়া — — সেই কারণে — ও অন্যান্য — দুষ্কার্য বাড়াইতেছে।

(খ) — ও কার্যের — কতকগুলি — লইয়া — — পল্লী বা — প্রতিষ্ঠা — হইবে।

(গ) জেলার কোন্ কোন্ — ব্যবসা-বাণিজ্য — পারে, তাহা — করিয়া — লোক — করতঃ — ব্যবসা করিবেন।

(ঘ) বন্ধনীর মধ্যে ভুল পদগুলি কাটিয়া দাও :

(১) গ্রামের শতকরা ৭৫ জন (ঋণগ্রস্ত/ঋণগ্রস্থ)

(২) এদের কৃষিকাজে (উৎপন্ন/উৎপাদন) হইতে চাষী জীবন ধারণ করে।

(৩) এই ঘোর (দারিদ্র্য নিবন্ধনে/দরিদ্র্য নিবন্ধনে/দারিদ্র্য নিবন্ধনে) দুই দিক দিয়া আমাদের স্বভাব (নষ্ট/নাশ) হইতেছে।

(৪) (স্বাস্থের/স্বাস্থ্যের) উন্নতি করিতে হইলে (চাষীদিগকে/চাষি-দিগকে) সেই (সম্বন্ধে/সম্বন্দে) শিক্ষাদান করিতে হইবে।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম

কল্যাণী মুখোপাধ্যায়

দীর্ঘদিনের অমানিশার গাঢ় অন্ধকার ঐন্দ্রজালিকের যাদুস্পর্শে দূরীভূত হয়ে গেল ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের এক আলোকোজ্জ্বল প্রভাতে। পরাধীনতার গ্লানি, সাম্প্রদায়িকতার বিষাক্ত পরিবেশ কেটে গিয়ে সৃষ্টি হল স্বাধীন ভারতের। 'হিন্দু-মুসলিম ভাই ভাই" ধ্বনিতে মুখর হয়ে উঠলো স্বাধীন ভারতের নরনারী। সৃষ্টি হল ভারতের এক নতুন ইতিহাস।

কিন্তু এই ইতিহাস সৃষ্টির পেছনে ছিল রক্ত-ঘাম-ঝরা আরো এক দীর্ঘ ইতিহাস। ব্রিটিশ শাসনের অক্টোপাস শান্তিপ্রিয় ভারতবাসীর অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনকে করেছিল পঙ্গু—ভারতের জন-জীবন হয়েছিল অতিষ্ঠ। ভারতের প্রত্যেকটি নরনারী তখন চেয়েছিল একটা বিরাট বিপ্লব—একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। কিন্তু সে বিস্ফোরণ ঘটাবার মত সাহস বা সামর্থ্য ছিল না সাধারণ ভারতবাসীর। কিন্তু সে হিম্মৎ হয়েছিল ভারতের বীর সিপাহীদের, তাদের মদৎ দিয়েছিল ভারতীয় রাজন্যবর্গ, তারা ব্রিটিশের উপরে হানলো এক বিরাট আঘাত। সেদিনের রানী লক্ষীবাঈ, নানা সাহেব, তাঁতিয়া টোপী, মঙ্গল পাণ্ডের আত্মত্যাগ ভারতবাসী কোনোদিন ভুলবে না—ভুলতে পারে না। স্বাধীনতার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ সিপাহীদের অন্তরে ছিল আগুন, কিন্তু সংগঠন ছিল দুর্বল, তাই শক্তিশালী ব্রিটিশের সঙ্গে ভারতের সিপাহী সেদিন এঁটে উঠতে পারে নি। ফলে স্বাধীনতাকামী সিপাহীদের অন্তরের কল্পনা সেদিন এক প্রকার অপূর্ণ-ই ছিল। স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা সেদিন সফল হতে পারেনি কিন্তু একটা প্রচণ্ড বিক্ষোভ ধূমায়িত হয়ে উঠেছিল ভারতবাসীর মনে।

ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত কয়েকজন ভারতসন্তান উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন ব্রিটিশের এই স্বৈরাচারে। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের

ইতিহাস পড়ে তাঁরা সচেতন হলেন মানুষের রাজনৈতিক অধিকার সম্বন্ধে। ফরাসী বিপ্লবের শিক্ষা তাঁদের মনে জাগিয়ে তুললো স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা। রামমোহন রায়, বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাধারা ভারতবাসীর মনে প্রাণে এনে দিল এক নবজাগরণ।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হল কংগ্রেস—প্রথম সর্বভারতীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান।

কংগ্রেসের পত্তনের গোড়ার দিকে এর সভ্যসংখ্যা ছিল সীমিত। কর্মধারাও ততটা বৈপ্লবিক ছিল না। ধীরে ধীরে শিক্ষিত সমাজের অধিকাংশই হয়ে উঠল জাতীয়তাবাদী—সভ্যসংখ্যা বেড়ে গেল। প্রভাবও হল বিস্তৃততর। প্রায় সেই সময়েই সারা বাংলায় এক বিপ্লবচিন্তার উদ্বোধন হল। বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা ছিল একই প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত—একই শাসকের অধীন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের বড়লাট লর্ড কার্জন এই বাংলাকে করলেন বিভক্ত। কিন্তু বাংলার জনগণ স্বীকার করল না এই কৃত্রিম বিভেদ। ভারতের জাতীয় নেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বালগঙ্গাধর তিলক, মহামতি গোখলে, মহাত্মা অশ্বিনীকুমার, শ্রীঅরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি দেশনেতা তীব্রভাবে প্রতিবাদ করলেন এই বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনার। যৌবনজল-তরঙ্গের ধ্বনি শোনা গেল জাতীয় কংগ্রেসে। শুরু হল বিলিতি দ্রব্য বর্জন। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস দাবী জানালেন 'স্বরাজ' প্রতিষ্ঠার। বাংলার যুব সম্প্রদায় গঠন করলেন গুপ্ত সমিতি—কল্পনা করলেন সশস্ত্র বিদ্রোহের। ব্রিটিশ সরকারের বন্দুক গর্জে উঠলো। আরম্ভ হল কঠোর নির্যাতন। শত শত যুবক বন্দী হয়ে রইলো কারা-প্রাচীরের অন্তরালে—নয়তো নির্বাসিত হল সুদূর আন্দামানে। আবার কেউ কেউ এগিয়ে গেল ফাঁসীর মঞ্চে।

অবশেষে হার মানলো ব্রিটিশ সরকার, ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে পরিত্যক্ত হল বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা।

এদিকে কংগ্রেস আন্দোলনও তীব্র হতে আরম্ভ করে। যথারীতি

আরম্ভ হল ইংরেজ সরকারের নিপীড়ন। ফলে প্রসারিত হয় কংগ্রেসের প্রভাব। ঠিক এই সময়েই কংগ্রেসের গণ-আন্দোলনে আবির্ভূত হলেন এক অভিনব জন-নেতা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। একনিষ্ঠতা এবং আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে অল্পকালের মধ্যেই গান্ধীজী হলেন কংগ্রেসের কর্ণাধার। তাঁর উদার আহ্বানে উত্তাল হয়ে উঠলো আসমুদ্র হিমাচল। কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র-শিক্ষক একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার অসহযোগ আন্দোলনে—তাঁর 'সত্যাগ্রহে'। অভিনব এই আন্দোলন। যা সত্য যা সঙ্গত তা রক্ষা করতে হবে। আসুক বাধা—আসুক নির্যাতন, তবু তাকে প্রতিরোধ করতে হবে। এ আন্দোলনে ছিল না বোমা-বারুদ-বন্দুকের আস্ফালন—ছিল না হিংসার উন্মত্ত তাণ্ডব। এ আন্দোলনের অস্ত্র ছিল অহিংসা-প্রেম-সঙ্ঘশক্তি ও নৈতিক বল।

১৯২১-এর আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ল ভারতের ছাত্রসমাজ—ভারতের কৃষিজীবী আর বুদ্ধিজীবীর দল। টনক নড়ল ব্রিটিশ সরকারের। এই 'অসহযোগ আন্দোলনে' নেমে এলেন বাংলার সর্ব-ত্যাগী মহাপুরুষ—চিত্তরঞ্জন দাশ। অতুল ঐশ্বর্য—বিপুল বৈভব হেলায় তুচ্ছ করে এসে দাঁড়ালেন পথের ধূলায়- হাত মেলালেন নিপীড়িত সর্বহারা জনগণের সঙ্গে। তাই তো তিনি দেশবন্ধু। আইন পরিষদে তিনি সোচ্চার হয়ে উঠলেন ইংরেজ শাসন-তন্ত্রের বিরুদ্ধে। ফলে কারাদণ্ড হয়ে উঠলো অনিবার্য। বহুবার কারাবরণ করলেন তিনি—কিন্তু স্বাধীনতার সংকল্প পরিত্যাগ করলেন না। অবশেষে মৃত্যু এসে তাঁর মরদেহকে ধূলায় মিশিয়ে দিলো—কিন্তু তাঁর মৃত্যুহীন প্রাণ বেঁচে রইলো প্রত্যেকটি মানুষের অন্তরে।

এদিকে 'অসহযোগ' আন্দোলনের পরে গান্ধীজী আরম্ভ করলেন 'আইন অমান্য আন্দোলন'। তাঁর প্রথম পদক্ষেপ শুরু হল 'লবণ আইন' ভঙ্গ করে। সেদিন তাঁর নেতৃত্বে কংগ্রেস-পতাকাতলে সমবেত হয়েছিল অগণিত ভারতবাসী—কংগ্রেসের জয়ধ্বনিতে কেঁপে উঠেছিল ব্রিটিশ শাসনের বুনিয়াদ।

তারপর বাধে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। ব্রিটিশ সরকার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জড়িয়ে দেয় ভারতবাসীকে। একদিকে তৈরী হয় যুদ্ধের সাজ সরঞ্জাম —অন্যদিকে সৃষ্টি হয় কৃত্রিম দুর্ভিক্ষের, ক্ষুধার জ্বালায় শত সহস্র নরনারী মৃত্যুবরণ করে আর হাজার হাজার ভারতীয় সিপাহীকে প্রেরণ করা হয় বিদেশে—শত্রুসৈন্যের মারণাস্ত্রের মুখে। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের কংগ্রেসের এক ঐতিহাসিক অধিবেশনে গান্ধীজী গর্জন করে উঠলেন—'কুইট ইণ্ডিয়া'—'ভারত ছাড়'। রক্তলোলুপ ইংরেজ সরকার তোমাকে এবার পাততাড়ি গোটাতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে গান্ধীজী শপথ নিলেন—"করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে"। কাজ করবো নয়তো প্রাণ বিসর্জন দেবো। উত্তাল হয়ে উঠলো সমগ্র ভারতবর্ষ। ক্ষিপ্ত ইংরেজ সরকার বন্দী করলো জাতীয় নেতাদের। প্রচণ্ড বিস্ফোরণে ফেটে পড়ল সারা হিন্দুস্থান। ভারতের যানবহন হল অচল—যোগাযোগব্যবস্থা বিপর্যস্ত—ইংরেজের শাসনযন্ত্র স্তব্ধ। বিয়াল্লিশের সেই আগস্ট আন্দোলনে ব্রিটিশ বুলেটের মুখে বুক পেতে দিল ভারতের বিক্ষুব্ধ নরনারী। ব্রিটিশ বুঝতে পারলো—ভারতে তার দিন শেষ হয়ে এসেছে। কিন্তু অদ্ভুত এই 'আগস্ট বিপ্লব'। এ বিপ্লবে বিক্ষুব্ধ ভারত-বাসী ইংরেজ হত্যায় মেতে ওঠেনি, কারণ এ বিপ্লব চালিত হয়েছে গান্ধীজীর অহিংসার মন্ত্রে। তাই বিশ্ব-ইতিহাসে বিখ্যাত এই বিপ্লব।

এই গণবিপ্লবের শেষ অঙ্কে ঈশান কোণে শোনা গেল বিষাণের ধ্বনি—"দিল্লী চলো", নেতাজীর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে 'আজাদ হিন্দ ফৌজ' গর্জে উঠলো, দিল্লীর লালকেল্লায় ওড়াতে হবে ভারতের জাতীয় পতাকা। কিন্তু কে এই নেতাজী? কে এই আজাদ হিন্দ ফৌজের নেতা?

নেতা সুভাষচন্দ্র বসু, বাংলার এক ধনীর সন্তান। অপূর্ব তাঁর মেধা—অনন্যসাধারণ তাঁর মনোবল। ইংলণ্ডে আই. সি এস. পাস করেও ব্রিটিশের দাসত্ব গ্রহণ করেননি। যোগ দিলেন কংগ্রেসে চরমপন্থী কংগ্রেস নেতা। কিন্তু মতভেদ ঘটলো কংগ্রেসের সঙ্গে। গড়লেন ফরোয়ার্ড ব্লক।

কিন্তু ব্রিটিশ সরকার দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় নজরবন্দী করে রাখলো সুভাষচন্দ্রকে—তাঁরই নিজের বাড়িতে। কিন্তু পুলিসের চোখে ধুলো দিয়ে তিনি পালিয়ে গেলেন ভারতের বাইরে—জার্মনীতে। জার্মানী ও জাপানের সঙ্গে হাত মিলিয়ে উপস্থিত হলেন সিঙ্গাপুরে—গড়ে তুললেন 'আজাদ হিন্দ্ ফৌজ'। স্থাপিত হল 'আজদ হিন্দ্ সরকার'। স্থলপথে ছুটে চললো আজাদ হিন্দ্ ফৌজ। নদনদী গিরি অতিক্রম করে তারা প্রবেশ করলো মণিপুর। কোহিমায় প্রোথিত করল ভারতের জয়পতাকা। জলপথে দখল করল আন্দামান ও নিকবর দ্বীপপুঞ্জ। কিন্তু বিধি বাম। প্রাকৃতিক দুর্যোগ আর বিমান বাহিনীর অভাবের জন্য পিছিয়ে আসতে বাধ্য হল সৈন্যদল ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে আণবিক বোমার আঘাতে পর্যুদস্ত জাপান অত্মসমর্পণ করে। শেষ হয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। সংবাদে প্রকাশিত হল—এক বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যুসংবাদ। কিন্তু নেতাজীর মৃত্যু নেই। দেহ তার ভস্মীভূত হলেও চিরদিন উজ্জ্বল হয়ে থাকবেন তিনি প্রত্যেকটি ভারতবাসীর অন্তরে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হল। কংগ্রেসের একমাত্র লক্ষ তখন ভারতের স্বাধীনতা, এই লক্ষ্যকে বানচাল করার জন্যে এক শ্রেণীর নেতা সম্প্রদায়িকতার জিগির তুলে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বাধিয়ে দেয় এক আত্মঘাতী দাঙ্গা। কিন্তু জাতীয় কংগ্রেসের নেতারা এড়িয়ে যান সে ভ্রতৃঘাতী যুদ্ধকে। ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে নানাভাবে বোঝাপড়া করে লাভ করেন স্বাধীনতা। ফলে ভারতবর্ষ দু-টুকরো হয়ে যায়। একভাগ ভারত, অন্যভাগ পাকিস্তান। স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে ভারত ঐশ্বর্য এবং উন্নতির পথে এগিয়ে চলে পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে সমান পদক্ষেপে।

অনুশীলনী

১। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন বলিতে কি বুঝ? উহার সাফল্যের কারণ কি?

২। 'আজাদ হিন্দ্ ফৌজের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৩। আগস্ট বিপ্লব কখন হইয়াছিল? এই বিপ্লব সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু লিখ।

৪। ব্যাখ্যা কর :—

(ক) অবশেষে মৃত্যু এসে তাঁর মরদেহকে……মানুষের অন্তরে।

(খ) এ আন্দোলনের অস্ত্র ছিল অহিংসা-প্রেম-সঙ্ঘশক্তি ও নৈতিক বল।

৫। নিম্নলিখিত শব্দগুলিকে স্বরচিত বাক্যে প্রয়োগ কর :—হিম্মৎ, মদৎ, পাততাড়ি, ঈশান, বিষাণ, মেধা, জিগির, অক্টোপাস, ধূমায়িত।

৬। পদান্তর কর :—নির্যাতন, নির্বাসিত, অবিভূ'ত, বিক্ষুব্ধ, সাংস্কৃতিক, সামর্থ্য, ধূমায়িত।

৭। সমাস ভাঙিয়া দেখাও :—আলোকোজ্জ্বল, রক্তলোলুপ, শান্তিপ্রিয়, দ্বীপপুঞ্জ, জয়পতাকা।

অতিরিক্ত অনুশীলনী

৮। কোন্ সালে ভারত স্বাধীন হয়? এই স্বাধীনতা যজ্ঞের প্রধান হোতা কে ছিলেন? "হিন্দু-মুসলমান ভাই ভাই—কখন বর্ণিত হয়? কোন সালে প্রতিষ্ঠিত হয় কংগ্রেস? এইটি কোন্ ধরনের প্রতিষ্ঠান? প্রথমে ইহার কর্মধারা কিরূপ ছিল?

৯। (ক) "কিন্তু বাংলার জনগণ স্বীকার করল না কৃত্রিম বিভেদ"।

—কৃত্রিম বিভেদ কি? কেই বা এই বিভেদ সৃষ্টি করেন? জনগণ কেন ঐ বিভেদ মেনে নেন নাই? তাঁহারা ঐ বিভেদ নষ্ট করিতে কি করিয়াছিলেন? ঐ বিভেদ নাশ করিবার ব্যাপারে কে কে নেতৃত্ব দান করেন?

(খ) 'বিলিতি বর্জন' কেন করা হইল? স্বরাজ প্রতিষ্ঠার দাবী কাহাদের? গুপ্ত সমিতি কি? উহাদের কল্পনাই বা কি ছিল? কবে কেন বৃটিশ সরকার বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনা ত্যাগ করেন?

(গ) 'তাঁর অসহযোগ আন্দোলন—তাঁর সত্যাগ্রহে'—তাঁরা কাহারা? অসহযোগ ও সত্যগ্রহ আন্দোলনের মূল লক্ষ্য কি? ঐ আন্দোলন কি ভাবে চালিত হয়? ঐ আন্দালনের অস্ত্র কি ছিল?

(ঘ) দেশবন্ধু কে? কেনই বা ঐ নাম? আইন অমান্য আন্দোলন কে, কখন, কেন শুরু করেন? 'ভারত ছাড়' আন্দোলন কখন আরম্ভ হয়? আগস্ট বিপ্লব কি?

—

মৃত্যুঞ্জয় মহাত্মা
সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায়

যুগে যুগে যে সকল মনীষী মানুষকে ভালবেসে মানুষের মধ্যে প্রচার করেছেন প্রেমধর্মের মূলমন্ত্র, সেই মানুষেরই হিংস্র নখরাঘাতে তাঁদের জীবনের ঘটেছে পরিসমাপ্তি। হিংসাকে যাঁরা আজীবন বর্জন করে গিয়েছেন, সেই হিংসার বিষাক্ত দংশনেই তাঁদের জীবনে নেমে এসেছে মৃত্যুর কালো যবনিকা। কিন্তু সে মৃত্যু তাঁদের কপালে পরিয়ে দিয়েছে অমৃতের জয়তিলক। মহাকালের অমোঘ বিধানকে আগ্রাহ্য করে তাঁরা হয়েছেন মৃত্যুঞ্জয়ী। তাই প্রেমের পূজারী যীশু রক্তস্নাত ক্রুশবিদ্ধ হয়ে করেছেন মৃত্যুবরণ—সত্যের পূজারী সক্রেটিসকে মুখে তুলে দিতে হয়েছে বিষভাণ্ড—অষ্টাদশী জোয়ান অব আর্কের দেহ ভস্মীভূত হয়েছে কুসংস্কারের কোপানলে। আর বিংশ শতাব্দীতে জাতির জনক, অহিংসার পূজারী মহাত্মা গান্ধীকে প্রাণ দিতে হয়েছে হিংসার বিষাক্ত বুলেটে। তাই তো দেশ-কালকে অগ্রাহ্য করে তারা হয়েছেন অমর। প্রতিটি শান্তিকামী মানুষের বুকে তাঁদের স্থান রয়েছে অক্ষয় হয়ে।

তাই জাতির জনকের মৃত্যু নেই—জন্ম আছে। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ২ অক্টোবর পোরবন্দরের কাবা গান্ধী আর পুতলীবাঈ-এর ঘরে যেদিন মোহন দাস করমচাঁদ জন্মগ্রহণ করেছিল সেদিন কেউ ভাবতেই পারেনি ব্রিটিশের শাসন-শৃঙ্খল মোচন করে এই শিশুই ভারতমাতাকে পরাবে স্বাধীনতার স্বর্ণমুকুট।

পিতামহ উত্তমচাঁদ সামান্যতম বেতনে চাকরি শুরু করেন কাথি-ওয়াড় রাজসরকারে। তারপরে ধীরে ধীরে কর্মদক্ষতা ও অধ্যবসায়ের দ্বারা অর্জন করেন দেওয়ানের পদমর্যাদা। পরে পিতা কাবা গান্ধীও এই পদ গ্রহণ করেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পদত্যাগ করে চলে আসেন রাজকোটে।

প্রথমে পোরবন্দরের এক পাঠশালায় এবং পরে রাজকোটের একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে ভর্তি হন মোহনদাস করমচাঁদ।



জীবনে সত্যের প্রতি নিষ্ঠা এবং আত্মসমীক্ষার সাধনা শুরু হয়েছিল

সেই কৈশোরেই, এবং সে সত্যনিষ্ঠা—সে আত্মসমীক্ষা ছিল তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য—জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত।

বিদ্যালয়-জীবনেই তিনি পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হন কস্তুরীবাঈ-এর সঙ্গে। তারপর প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কলেজ-জীবন আরম্ভ করেন ভবনগরের শ্যামাদাস কলেজে, পরবর্তী অধ্যায় বিলেতে। আজ বিলেত যাওয়াকে আমরা যত সহজ মনে করি সেদিন কিন্তু এমনটি ছিল না। সেদিন ছিল সামাজিক বিধিনিষেধের শত বেড়াজাল। তবু গান্ধীজী সেদিন সমাজপতিদের রক্তচক্ষু হেলায় তুচ্ছ করে ব্যারিস্টারী পড়ার জন্য পাড়ি দিলেন বিলেতে। দিনটি ছিল ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ৪ সেপ্টেম্বর।

তিন বছরের প্রবাসজীবনের নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও আত্ম-সমীক্ষার মধ্য দিয়ে নিজেকে গড়ে তুললেন খাঁটি ভারতীয় করে। তথাকথিত 'সাহেব' হওয়ার লোভকে জয় করে ফিরে এলেন দেশে। কিন্তু দেশের মাটিতে পা দিয়েই শুনলেন মাতা পূতলীবাঈ ইহলোকে নেই। মাতৃবিয়োগের শোক সাময়িকভাবে মর্মাহত করলেও কর্তব্যচ্যুত করতে পারেনি তাঁকে।

আরব সাগর পাড়ি দিয়ে তিনি গেলেন দক্ষিণ আফ্রিকার ন্যাটালে—এক ভারতীয় ব্যবসায়ীর মামলা পরিচালনার উদ্দেশ্যে। কিন্তু ন্যাটালে গিয়ে দেখলেন—'কালা আদমী'র উপর অকথ্য অত্যাচার। শ্বেতাঙ্গ-ইংরেজদের চোখে কৃষ্ণকায় ভারতীয় এবং আফ্রিকানরা মানুষ নয়, মেষ। জীবনের সর্বপ্রকার অধিকার থেকে বঞ্চিত তারা। গান্ধীজী কিন্তু নীরবে সে অত্যাচার মেনে নিলেন না। সে অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার জন্য সংগঠিত করতে লাগলেন সেখানকার কৃষ্ণকায়দের। তাঁর বলিষ্ঠ ও নির্ভীক সত্যাগ্রহের ফলে ইংরেজ সরকারের কঠোর নিষ্পেষণ হ্রাস পেলো কিছুটা। আংশিক সাফল্য লাভ করলো গান্ধীজীর এই আন্দোলন। এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে গিয়ে তাঁকে ভোগ করতে হয়েছে চরম লাঞ্ছনা, নির্মম অত্যাচার। কিন্তু পরিবর্তে দক্ষিণ আফ্রিকার

জনগণের মধ্যে তিনি পেলেন বিপুল স্বীকৃতি—আর অর্জন করলেন এক গভীর আত্মবিশ্বাস—এক অদম্য মনোবল।

সেই আত্মবিশ্বাস—সেই সংগ্রামী মনোবল নিয়ে তিনি ফিরে এলেন ভারতবর্ষে। এসে দেখলেন এখানেও ইংরেজ সরকারের নিষ্ঠুর নিস্পেষণ। ভারতের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সামাজিক জীবন জর্জরিত। ইংরেজ সরকারের বিষাক্ত নিঃশ্বাসে মুক্তি—সংগ্রামের সৈনিক গান্ধীজী যোগ দিলেন বিচিত্র আন্দোলনে—'অসহযোগ আন্দোলন', 'লবণ-আইন-অমান্য আন্দোলন' এবং 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে। গান্ধীজীর উদার আহ্বানে জমায়েত হল ছাত্র-শিক্ষক-কেরানী-ব্যবসায়ী-কৃষক-স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে। গান্ধীজীর সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে তারাও বলে উঠলো "করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে"—উদ্দেশ্য সাধন করবো নয়তো প্রাণ দেবো। বিশাল সেই জন-সমুদ্রের পুরোভাগে দাঁড়িয়েছিলেন গান্ধীজী—সঙ্কল্পে ছিলেন অটুট—উদ্দেশ্য অটল।

কিন্তু সে আন্দোলনে হিংসার স্থান ছিল না। অহিংসাই ছিল তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র। অহিংসার অস্ত্র দিয়ে হিংসাকে জয় করা—সত্য দিয়ে অসত্যের মূলোৎপাটন করাই ছিল তাঁর একমাত্র লক্ষ্য। অহিংসার সেই অস্ত্রের সম্মুখে থমকে দাঁড়িয়েছিল অত্যাচারী ইংরেজ সরকার, বাধ্য হয়েছিল এদেশ থেকে তল্পিতল্পা গুটাতে। গান্ধীজীর স্বপ্ন হয়েছিল সফল। দীর্ঘ অমানিশার রাত্রি শেষ হয়েছিল ১৯৪৭-এর ১৫ই আগস্টের আলোকোজ্জ্বল প্রভাতে।

শুধু স্বাধীনতা লাভই তাঁর জীবনের শেষ কথা ছিল না। তিনি চেয়েছিলেন সমাজের দূষিত ক্ষতকে দূর করে এক স্বাস্থ্যোজ্জ্বল সোনার ভারত গড়তে। অস্পৃশ্যতা, সাম্প্রদায়িকতা ও দারিদ্র্যের অভিশাপ ভারতবাসীর অঙ্গে অঙ্গে সৃষ্টি করেছিল উৎকট ব্যাধি। গান্ধীজী তার বিরুদ্ধে শুরু করলেন এক বিরাট অভিযান। চণ্ডাল-মুচি-মেথরকে উদ্ধার করলেন অস্পৃশ্যতার পঙ্ক থেকে। হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার দুর্দিনে পরিক্রমা করলেন দাঙ্গা

দুর্গত পাঞ্জাব-বিহার-কলিকাতা-নোয়াখালিতে। দারিদ্র্যের অভিশাপ দূর করার জন্য প্রচলন করলেন সরকার, উৎসাহিত করলেন দেশের কুটীর শিল্পকে, মানব-সেবার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন ক্লান্তিহীন কর্মী। দুঃস্থ মানবের সেবায় তিনি ছিলেন উন্মুখ। যৌবনে বুয়র যুদ্ধের অ্যাম্বুলেন্স বাহিনীর পরিচালকরূপে যে সেবাব্রত আরম্ভ করেছিলেন জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত সেই মানব-সেবাই ছিল তাঁর ধ্যান-জ্ঞান স্বপ্ন।

কিন্তু মানব-দরদী অহিংসার পূজারী মহাত্মা প্রাণ দিলেন উন্মত্ত মানুষেরই হিংসার কোপানলে। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ জানুয়ারী, রাজধানী দিল্লীর এক প্রার্থনা সভায় চলেছেন গান্ধীজী। হঠাৎ গর্জে উঠলো হিংসার আগ্নেয়াস্ত্র। গান্ধীজীর নিষ্প্রাণ দেহ লুটিয়ে পড়লো বিড়লা-ভবনের প্রার্থনাসভায়। শান্তিকামী মহামানবের তাজা রক্তে চিহ্নিত হয়ে রইলো দিল্লীর বিড়লা-ভবন। শোকে-দুঃখে-লজ্জায় সমগ্র ভারত স্তব্ধ হতবাক্—সমগ্র বিশ্ব বিমূঢ়।

কোটি কোটি মানুষ জন্মগ্রহণ করে এই পৃথিবীর মাটিতে—আবার একদিন তারা এই মাটিতেই মিলিয়ে যায়। কিন্তু তাঁদেরই মধ্যে কেউ কেউ অমর হয়ে থাকেন ইতিহাসের পাতায়, অক্ষয় হয়ে থাকেন মানুষের অন্তরে। গান্ধীজী তেমনি একজন মানুষ। সেবায় প্রেমে, কর্মে আর মহত্ত্বে তিনি উজ্জ্বল হয়ে আছেন ইতিহাসের পাতায়—জীবন্ত হয়ে থাকবেন প্রতিটি মানুষের অন্তরের অন্তঃস্থলে।

আজ হিংসার এক কালো যবনিকা নেমে এসেছে সমগ্র ভারতবর্ষে, তাই অহিংসার পূজারী এই মৃত্যুঞ্জয় মহামানবের জীবন-আলেখ্য দেশবাসীকে দেখাবে এক আলোকময় পথ—দেবে এক অমৃতলোকের সন্ধান।

অনুশীলনী

১। গান্ধীজী দক্ষিণ-আফ্রিকা যাইবার পূর্বে সেখানকার অবস্থা কিরূপ ছিল? সেখানকার অভিজ্ঞতা দ্বারা তিনি কি শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন?

২। 'সোনার ভারত' গড়িতে গিয়া গান্ধিজী কি করিয়াছিলেন?

৩। ব্যাখ্যা কর :

(ক) অহিংসার সেই অস্ত্রের সম্মুখে……সরকার।

(খ) শান্তিকামী মহামানবের……বিড়লা-ভবন।

৪। অর্থ লিখ :

যবনিকা, অমোঘ, বেড়াজাল, রক্তচক্ষু, আত্মসমীক্ষা।

৫। পদ পরিবর্তন কর :

বঞ্চিত, বলিষ্ঠ, কঠোর' নিষ্পেষণ, সাফল্য, লাঞ্ছনা, স্বীকৃতি, আহ্বান।

৬। সমাস ভাঙ্গিয়া দেখাও :

রক্তস্নাত, ক্রুশবিদ্ধ, বিষভাণ্ড, কোপানল, স্বর্ণমুকুট, কর্ম দক্ষতা, বিধিনিষেধ।

অতিরিক্ত অনুশীলনী

৭। কিন্তু সে মৃত্যু তাঁদের কপালে পরিয়ে দিয়েছে অমৃতের জয়তিলক"। "সে মৃত্যু" কোন্ শ্রেণীর মৃত্যু? 'তাঁদের কাহাদের? এরূপ কয়েকজন মৃত্যুজয়ীর নাম কর এবং তাঁহাদের কাহাকে কিভাবে প্রাণ দিতে হয় সংক্ষেপে বল।

৮। "আরব সাগর পাড়ি দিয়ে তিনি গেলেন দক্ষিণ-আফ্রিকার ন্যাটালে"। তিনি কে? কেনই বা তিনি ন্যাটালে গেলেন? সেখানে গিয়া তিনি কি দেখিলেন? তিনি সেখানে যাহা দেখিলেন তাহার প্রতিবাদে তিনি কি করেন এবং তাহার পরিণতিই বা কী হয়?

৯। "শান্তিকামী মানবের তাজা রক্তে চিহ্নিত হয়ে রইলো দিল্লীর বিড়লা ভবন"। ঐ উদ্ধৃতিটুকু কোথা হইতে লওয়া, হইয়াছে? ঐটি কাহার উক্তি? কোন্ প্রসঙ্গেই বা এই উক্তি করা হইয়াছে? বক্তার কথাকয়টির তাৎপর্য নিজের কথায় বল।

১০। (ক) নিম্নলিখিত তারিখগুলি কি জন্য বিখ্যাত বল :

(১) ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ২ রা অক্টোবর।

(২) ১৯৪৭-এর ১৫ই আগস্ট।

(৩) ১৯৪৮ সালের ৩০শে জানুয়ারি।

(খ) নিম্নলিখিত কথাগুলির অর্থ বল :

করেঙ্গে ইয়ে-মরেঙ্গে, ভারত ছাড়ো ও লবন আইন অমান্য আন্দোলন।

(গ) সাধুরূপ লিখ :

তাঁদের, পরিচয় দিয়েছে, রয়েছে অক্ষয় হয়ে, জয় করে ফিরে এলেন, করতে পারেনি, নেতৃত্ব দিতে, দিতে তাঁকে, তারাও বলে উঠলো, লুটিয়ে পড়লো।

(ঘ) শূন্যস্থান পূর্ণ কর :

— অস্পৃশ্যতা, — ও —অভিশাপ — অঙ্গে — সৃষ্টি — উৎকট। — তার বিরুদ্ধে— — এক — অভিযান। — — — উদ্ধার করলেন — পঙ্ক —। হিন্দু-মুসলমানের — দাঙ্গায় — — পরিক্রমা — দাঙ্গাদুর্গত — —।

শ্রীরামকৃষ্ণ
স্বামী বিবেকানন্দ



[নিষ্ঠাবান এক ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মিয়াছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। লৌকিক বিদ্যাকে পরিত্যাগ করিয়া আধ্যাত্মিক জ্ঞান-অন্বেষণে তিনি আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। পরবর্তী জীবনে সেই জ্ঞান তিনি বিতরণ করিয়াছিলেন মানবজাতির কল্যাণে। বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিয়া তিনি এক সহজ সরল পথের নির্দেশ দিয়াছিলেন। আর এই হানাহানির যুগে শ্রীরামকৃষ্ণের ন্যায় মনীষীর প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় না।]

আজ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের নাম কোটি কোটি লোকপূর্ণ ভারতের সর্বত্র পরিচিত। শুধু তাহাই নহে, তাঁহার শক্তি ভারতের বাহিরেও বিস্তৃত হইয়াছে। বঙ্গদেশের এক নিভৃত পল্লীগ্রামে জন্মিয়া এই বালক কেবল নিজ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও অন্তঃশক্তি বলে সত্য উপলব্ধি করিয়া অপরকে প্রদান করিয়া গেল।

ভারতের চারদিকে যখন নানাবিধ সংস্কার-চেষ্টা হইতেছিল, সেই সময় ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ ফেব্রুয়ারী, বঙ্গদেশের এক গ্রামাঞ্চলে দরিদ্র ব্রাহ্মণকুলে একটি বালকের জন্ম হয়। তাঁহার পিতামাতা অতি নিষ্ঠাবান সেকেলে ধরনের লোক ছিলেন। তাঁহারা খুব দরিদ্র ছিলেন, কিন্তু অনেক সময় কোন দরিদ্র অতিথিকে খাওয়াইতে গিয়া

গৃহিণী সারাদিন উপবাস করিয়া থাকিতেন। এইরূপ পিতামাতা হইতে এই শিশু জন্মগ্রহণ করিলেন। অল্পবয়সেই তাঁহার পিতৃ-বিয়োগ হয় এবং তিনি পাঠশালায় প্রেরিত হন।

অল্পদিন পরে তাঁহার দৃঢ় ধারণা হইল যে সমুদয় লৌকিক বিদ্যার উদ্দেশ্য কেবল সাংসারিক উন্নতি। সুতরাং তিনি লেখাপড়া ছাড়িয়া আধ্যাত্মিক জ্ঞানান্বেষণে সম্পূর্ণরূপে জীবন সমর্পণ করিতে সংকল্প করিলেন। পিতার মৃত্যুর পর সংসারে প্রবল দারিদ্র আসিলে এই বালককে নিজের আহারের সংস্থানের চেষ্টা করিতে হইল। তিনি কলিকাতার সন্নিকটে একটি স্থানে যাইয়া তথাকার মন্দিরের পুরোহিত নিযুক্ত হইলেন। মন্দিরে আনন্দময়ী মাতার একটি মূর্তি ছিল। এই বালককে প্রত্যহ প্রাতে ও সায়াহ্নে তাঁহার পূজা নির্বাহ করিতে হইত। এইরূপ করিতে করিতে এই এক ভাব আসিয়া তাঁহার মনকে অধিকার করিল—"এই মূর্তির ভিতর কিছু বস্তু আছে কি? ইহা কি সত্য যে জগতে এই আনন্দময়ী মা আছেন, এসব স্বপ্নতুল্য মিথ্যা"—বালকের হৃদয়ে এই ধারণা প্রবেশ করিলে, তাঁহার সারা-দিন কেবল এই ভাবনা—কিসে প্রত্যক্ষ দর্শন হইবে।

তাঁহার জীবনের এই ভাব সম্বন্ধে তিনি অনেকবার বলিয়াছেন, 'কখন সূর্য উদয় হইল কখন বা অস্ত গেল, তাহা আমি জানিতে পারিতাম না।' মনুষ্য-হৃদয়ে এইরূপ ব্যকুলতা আসিয়া থাকে। দিবাবসানে সন্ধ্যাকালে যখন মন্দিরের আরতি শঙ্খ-ঘণ্টাধ্বনি শুনিতে পাইতেন, তাঁহার মন তখন অতিশয় ব্যাকুল হইত। এইরূপে দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস সত্যলাভের জন্য অবিশ্রান্ত চেষ্টায় কাটিল। তখন তিনি নানাবিধ অলৌকিক দৃশ্য, অদ্ভুত রূপ দেখিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার নিজ স্বরূপের রহস্য তাঁহার নিকট ক্রমশঃ উদঘাটিত হইতে লাগিল। যেন আবরণের পর আবরণ অপসারিত হইতে লাগিল।

সহস্র সহস্র ব্যক্তি এই অপূর্ব মানুষকে দেখিতে, তাঁহার সরল গ্রাম্য ভাষায় উপদেশ শুনিতে আসিতে লাগিল। তিনি যাহা

বলিতেন, তাহার প্রত্যেক কথাতেই একটি শক্তি মাখান থাকিত, প্রত্যেক কথাই হৃদয়ের তমোরাশি দূর করিয়া দিত।

তাঁহার জীবনে আদৌ বিশ্রাম ছিল না, তাঁহার জীবনের প্রথমাংশ ধর্ম উপার্জনে ও শেষাংশ উহার বিতরণে ব্যায়িত হইয়াছিল। তাঁহার মানবজাতির প্রতি এরূপ অগাধ প্রেম ছিল যে, যাহারা তাঁহার কৃপালাভার্থ আসিত, এইরূপ সহস্র সহস্র লোকের মধ্যে অতি সামান্য ব্যক্তিও তাঁহার কৃপালাভে বঞ্চিত হইত না। মাসের পর মাস এরূপ হইতে লাগিল—অবশেষে এরূপ কঠোর পরিশ্রমে তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া গেল। ক্রমে তাঁহার গলায় একটি ঘা হইল, তথাপি তাঁহাকে বুঝাইয়াও কথা বলা বন্ধ করা গেল না।

একদিন তিনি আমাদিগকে, সেইদিন দেহত্যাগ করিবেন, ইঙ্গিতে জানাইলেন এবং বেদের পবিত্রতম মন্ত্র 'ওঁ' উচ্চারণ করিতে করিতে মহাসমাধিস্থ হইলেন। এইরূপে সেই মহাপুরুষ আমাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন।

এইরূপ ব্যক্তির এক্ষণে প্রয়োজন—এই যুগে এইরূপ লোকের আবশ্যক। যে দেশে এইরূপ ব্যক্তির যতই অভ্যুদয় হইবে, ততই সেই দেশ উন্নত হইবে। আর যে দেশে এইরূপ লোক একেবারে নাই সে দেশের পতন অনিবার্য কিছুতেই উহার উদ্ধারের আশা নাই। ত্যাগ ও প্রত্যক্ষানুভূতির সময় আসিয়াছে, অতএব জগতের বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে সামঞ্জস্য আছে তাহা দেখিতে পাইবে, বুঝিবে—বিবাদের কোন প্রয়োজন নাই, আর তখনই সমগ্র মানবজাতির সেবা করিতে প্রস্তুত হইতে পারিবে। মদীশ আচার্যদেবের জীবনে ইহাই উদ্দেশ্য ছিল—সকল ধর্মের মধ্যে যে মূলে ঐক্য রহিয়াছে তাহা ঘোষণা করা।

অনুশীলনী

১। শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে সংক্ষেপে একটি নিবন্ধ রচনা কর।
২। শ্রীরামকৃষ্ণের দিনগুলি কিভাবে কাটিত?
৩। বর্তমানে রামকৃষ্ণের মত ব্যক্তির প্রয়োজন কেন?
৪। কিভাবে রামকৃষ্ণের জীবনে ভক্তির উদ্বোধন হইল?

৫। ব্যাখ্যা লিখ :

(ক) কখন সূর্য উদয় হইল……পারিতাম না।

(খ) কোন দেশে এইরূপ……উদ্ধারের আশা নাই।

(গ) ত্যাগ ও প্রত্যক্ষানুভূতির সময়…প্রস্তুত হইতে পারিবে।

৬। অর্থ লিখ :

মদীয়, আরতি, সায়াহ্ন, অভ্যুদয়।

অতিরিক্ত অনুশীলনী

৭। "এই মূর্তির ভিতর কিছু বস্তু আছে কি?"

—এই চিন্তা কাহার? কখন কি অবস্থায় তাহার মনে এই চিন্তা আসে? মূর্তিটি কাহার? কোথায় এই মূর্তি অবস্থিত ছিল? কেনই বা বক্তা সেখানে গিয়েছিলেন? সেখানে তাঁহার কাজই বা কি ছিল।

৮। "ইহা কি সত্য, যে জগতে এই আনন্দময়ী আছেন, এসব স্বপ্নতুল্য মিথ্যা?"

এ চিন্তা কাহার? আনন্দময়ী মা কাহার উদ্দেশ্যে বলা হইয়াছে? 'এসব' কোন সব? যাহার এই ধারণা তাঁহার সারাদিনের ভাবনা কি ছিল?

৯। নিম্নলিখিত উদ্ধৃতিগুলি

(ক) কোথা হইতে গৃহীত?

(খ) কাহার উক্তি?

(গ) কোন্ প্রসঙ্গে এইসব উক্তি?

(ঘ) উক্তিগুলির প্রত্যেকটির অর্থ সহজ সরল ভাষায় বল।

(১) কখন সূর্য উদয় হইল……পারিতাম না।

(২) কোন দেশে এইরূপ……উদ্ধারের আশা নাই।

(৩) ত্যাগ ও প্রত্যক্ষানুভূতির সময়……প্রস্তুত হইতে পারিবে।

১০। (ক) "শ্রীরামকৃষ্ণ" এই মহাপুরুষ প্রসঙ্গটির রচয়িতা কে? তাঁহার অন্য কোন রচনার নাম জান কি? তাঁহার প্রতিষ্ঠিত কোন প্রতিষ্ঠানের নাম কর।

(খ) বিপরীত শব্দ লিখ :

পরিচিত, অন্তঃশক্তি, অপরকে, সংস্কার, লৌকিক, বিদ্যা, সাংসারিক, আধ্যাত্মিক, আহার, আনন্দময়ী, উচ্চারণ, সায়াহ্ন।

(গ) পদান্তর কর :

অন্বেষণ, বিস্তৃত, প্রতিজ্ঞা, প্রদান, চেষ্টা, দরিদ্র, অতিথি, অপসারিত, সমর্পণ, প্রবেশ, পবিত্র, সপ্তাহ, আরম্ভ, বিতরণ, লাভ, উচ্চারণ।

লুই পাস্তুর

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

ফ্রান্সের এক সামান্য পল্লীতে ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের ২৭ ডিসেম্বর বিশ্বের প্রসিদ্ধ জীবাণু-বিজ্ঞানী লুই পাস্তুর জন্মগ্রহণ করেন। লুই পাস্তুর জন্মগ্রহণ করবার সঙ্গে সঙ্গে মানব-সভ্যতায় একটা নূতন অধ্যায়ের সংযোগ হয়ে গেল। যে অদৃশ্য শত্রু মানুষের দৃষ্টি এবং বুদ্ধির সীমার বাইরে থেকে এতকাল ধরে নিঃশব্দে মানুষের জীবনকে পদে পদে ব্যাহত করে এসেছে, লুই পাস্তুর সেই শত্রুর বিরুদ্ধে সমস্ত মানব-সভ্যতার চেতনাকে জাগ্রত করে দিয়ে যান এবং তাঁরই অসামান্য বিজ্ঞান-প্রতিভার সাধনায় জগতে জীবণুতত্ত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

তিনি প্রথমে রসায়নবিদ্যা চর্চা করতেন, এবং রাসায়নিক হিসাবেই তিনি প্রথম বৈজ্ঞানিক মহলে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। প্রথম জীবনে জীবাণু সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ কোন কৌতূহল ছিল না।

স্ফটিকের দানা দিয়ে তিনি গবেষণা আরম্ভ করেন। হঠাৎ একটা ব্যাপারে তাঁর দৃষ্টি সেই অদৃশ্য প্রাণিজগতের উপর এসে পড়ল।

সেই সময়ে রাসায়নিক হিসাবে তিনি এতদূর কৃতিত্ব অর্জন করেন যে, ৩২ বছর বয়সেই তিনি লিলি নগরে বৈজ্ঞানিক মণ্ডলীর অধ্যক্ষ হন। বিট, গম এবং শর্করা থেকে গাঁজন ক্রিয়া দ্বারা সুরাসার তৈরি করার জন্যে এই প্রদেশ বিখ্যাত।

হঠাৎ বিশেষ কি কারণে, যাঁরা এই সুরসার অর্থাৎ অ্যাল্‌কোহল

তৈরি করার ব্যবসা করতেন তাঁরা দেখলেন, যে-পাত্রে তাঁরা সুরাসার তৈরি করছিলেন, সেই পাত্র ব্যবহার করলেই সুরা টকে গিয়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এইভাবে তাঁদের বহু টাকা অনবরত ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে। তখন তাঁরা এর কারণ নির্ণয় করার জন্যে পাস্তুরকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে এলেন। তিনি এসে বহু পরীক্ষার পর দেখলেন এক রকমের অদৃশ্য প্রাণী, তারা গোপনে এক রকমের অ্যাসিড উৎপন্ন করে মানুষের সমস্ত চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিচ্ছে। তিনি তাদের নাম দিলেন ল্যাক্‌টিক্ অ্যাসিড ব্যাক্‌টিরিয়া (ব্যাকটিরিয়া জীবাণুদের আর একটি নাম)।

এই ব্যাক্‌টিরিয়ার খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাস্তুরের ধারণা হল যে, নিশ্চয়ই আরও এই ধরনের বিভিন্ন রকমের জীবাণু আছে, যারা ঠিক এমনি দৃষ্টির অগোচর থেকে মানুষের ভয়াবহ সব ক্ষতি করছে। কে জানে তাদের কি চরিত্র, কে জানেই বা তাদের কি শক্তি।

তিনি ছিলেন রাসায়নিক। জীব-বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁকে নূতন করে পড়াশোনা আরম্ভ করতে হল। তাঁর জীবনের এই অধ্যায়ের যে নিষ্ঠা, যে-একাগ্রতা, যে পরিশ্রম করবার অসাধারণ শক্তির পরিচয় আমরা পাই, তা সত্যিই অনন্যসাধারণ। শুধু যুগান্তরকারী আবিষ্কারক বলে নয়, আদর্শ চরিত্র হিসাবেও পাস্তুরের নাম চিরকাল জগদ্বরেণ্য হয়ে থাকবে। লোককে আমরা রহস্য করি, কিন্তু পাস্তুর সত্যিই তাঁর নিজের বিয়ের দিন ভুলে গিয়েছিলেন। নিমন্ত্রিত বন্ধুরা গির্জেয় এসে দেখলেন, পাস্তুরের খোঁজ নেই চারিদিকে খুঁজতে খুঁজতে দেখা গেল যে, তিনি তখন তাঁর ল্যাবরেটরিতে একমনে গবেষণা করছেন।

জীবাণু-বিজ্ঞানীদের মধ্যে লুই পাস্তুরই সর্বপ্রথম সন্দেহাতীত-ভাবে প্রমাণ করলেন যে, আপনা থেকে শূন্য থেকে, জীবাণু জন্মগ্রহণ করতে পারে না। এক রকম জীবাণু আছে যাদের তাপের প্রভাবে বিনষ্ট করা যায় না। এই জীবাণুগুলি আগেকার সমস্ত বৈজ্ঞানিক

পরীক্ষায় বিদ্যমান থেকে, স্বয়ম্ভুবাদের সম্বন্ধে বিতর্ককে ঘোরাল করে তুলেছিল। তিনি দেখলেন যে, জল, বাতাস, ধুলো, ময়লা এই সব জিনিসকে আশ্রয় করে নিত্য এই সব দৃষ্টির অগোচর জীবাণুর দল এক জিনিস থেকে আর এক জিনিসে যাতায়াত করছে, এক মানুষের দেহ থেকে আর এক মানুষের দেহে যাচ্ছে। সেইদিন থেকে চিকিৎসা-জগতে এক নবযুগের সূচনা হল। এবং তার আদি প্রবর্তক হলেন লুই পাস্ত্যর।

সেই সময় অস্ত্র চিকিৎসার নামে লোকে আতঙ্কিত হয়ে উঠত। হাসপাতালে লোকে আসতে চাইত না। তার কারণ, অস্ত্র চিকিৎসার পর অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্ষতস্থান দূষিত হয়ে উঠত এবং তার ফলে হতভাগ্য রোগীকে যমযন্ত্রণা ভোগ করে মরতে হত। ধোয়াবার জলে, হাতের আঙ্গুলে, বাতাসে, যে ছুরি ব্যবহার করা হ'ত তারই ডগায় যে অসংখ্য জীবাণু রয়েছে, তারা গিয়ে সেই ক্ষতস্থানকে দূষিত করে দিচ্ছে—এ ব্যাপার মানুষ পাস্ত্যরের আবিষ্কারের আগে ভাবতেই পারে নি।

পাস্ত্যর যখন ফ্রান্সে জীবাণু সম্পর্কে তাঁর যুগান্তকারী গবেষণা করছিলেন, সেই সময় ইংলণ্ডে লিস্টার নামে একজন ডাক্তার রোগীদের সেই অসহ্য যন্ত্রণা দিনের পর দিন দেখে ব্যাকুলভাবে তার প্রতিকারের পথ খুঁজছিলেন। পাস্ত্যরের আবিষ্কার তাঁর অন্ধকার পথে সহসা আলো জ্বেলে দিল। লিস্টার পরীক্ষা করে দেখালেন যে, এই সব জীবাণুদের সংস্পর্শ থেকে যদি ক্ষতস্থানটি সংরক্ষণ করা যায়, তাহলে আর ক্ষত দূষিত হতে পারে না। এবং এইভাবে লিস্টার অস্ত্র চিকিৎসার ব্যাপারে যুগান্তর নিয়ে এলেন। তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ, অস্ত্র-চিকিৎসার সময় ডাক্তারেরা কি রকম সতর্কতার সঙ্গে যেসব জিনিস ক্ষতস্থানের সংস্পর্শে আসবে, তাদের শোধন করে নেন। এই শোধন করার মানেই, সেই সব জিনিসে যদি কোন জীবাণু থাকে, তা নষ্ট করে ফেলা। একজন বড় ইতিহাসকার লিখেছেন যে, জগতে মানুষ যুদ্ধ করে যত লোককে মেরে

ফেলেছে, তার চেয়ে ঢের বেশী লোককে পাস্তার আর লিস্টার বাঁচিয়েছেন।

জীবাণুদের নিয়ে পর্যবেক্ষণ করতে করতে পাস্ত্যরের দৃঢ় বিশ্বাস হল যে, মানুষের বহু মারাত্মক ব্যাধির মূলে হয়ত আছে এই সব জীবাণু। তিনি ডাক্তারী জানতেন না। নিজের দু'জন ছাত্রের কাছে তিনি তা শিখতে আরম্ভ করলেন। সেই সময় ফ্রান্সে এবং জার্মানীতে গৃহপালিত পশু এবং বিশেষ করে ভেড়ার পালে ভয়াবহ মড়ক দেখা গেল। আনথ্রাক্স নামে পশু রোগে দলে দলে পশু মারা যেতে লাগল। বহু ডাক্তার বহুভাবে এই রোগ নিবারণ করবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু কেউই সফল হতে পারলেন না। পাস্ত্যর এই সম্পর্কে বহু গবেষণা করে চিকিৎসা-জগতে আর একটি যুগান্তকারী আবিষ্কার করলেন। জীবাণুরা দেহে প্রবেশ ক রক্তে একরকম বিষ সঞ্জাত করে। এই বিষই হল আবার সেই রোগের ঔষধ। রুগ্ন দেহ থেকে এই বিষ সংগ্রহ করে যদি প্রতিষেধক টিকা দেওয়া যায়, তাহলে এই রোগের আক্রমণ থেকে পশুরা বাঁচতে পারে। অবশ্য তাঁর বহু পূর্বে জেতার এই সূত্র অনুসারে মানুষের দেহের জন্যে বসন্তের টিকা আবিষ্কার করে-ছিলেন। পাস্ত্যরের উদ্ভাবিত এই চিকিৎসা-প্রণালীর ফলে জার্মানী এবং ফ্রান্সের পশু ব্যবসায়ীরা রক্ষা পেলেন। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দশ বছরে চৌত্রিশ লক্ষ ভেড়াকে এবং প্রায় চার লক্ষ আটত্রিশ হাজার গৃহপালিত পশুকে প্রতিষেধক টিকা দেওয়ার ফলে ভেড়ার মৃত্যুহার যথাক্রমে শতকরা ১টি ও অন্যান্য পশুর পক্ষে হাজারে ৩টিতে এসে দাঁড়াল।

তারপর তিনি আর একটি মারাত্মক ব্যাধির চিকিৎসার দিকে দৃষ্টি দিলেন। ক্ষিপ্ত পশুর দংশনে জলাতঙ্ক রোগের চিকিৎসারও তিনি প্রবর্তক। আজ দেশে দেশে পাস্ত্যর-চিকিৎসালয় স্থাপিত হয়েছে এবং প্রতি বছরে হাজার হাজার রোগী তাঁর উদ্ভাবিত প্রণালী অনুসারে এই ভয়াবহ রোগের কবল থেকে মুক্তি লাভ

করছে। এই চিকিৎসা-প্রণালী আবিষ্কার করে প্রথমে যে বালকটির তিনি চিকিৎসা করেন, কুকুরদষ্ট সেই বালকটির একটি প্রস্তরমূর্তি ফ্রান্সে আছে।

অনুশীলনী

১। "শুধু যুগান্তকারী আবিষ্কারক বলে নয়, আদর্শ চরিত্র হিসাবেও পাস্তুরের নাম চিরকাল জগদ্বরেণ্য হয়ে থাকবে"—পাস্তুরের জীবন-কাহিনী আলোচনা করিয়া এই উক্তির সত্যতা প্রমাণ কর।

২। পাস্তুরের বিভিন্ন আবিষ্কার সম্বন্ধে আলোচনা কর। কোন আবিষ্কারের জন্য মানবসমাজ তাঁহার নিকট সর্বাপেক্ষা ঋণী?

৩। ব্যাখ্যা কর :—

(ক) যে অদৃশ্য শত্রু......সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

(খ) একজন বড় ইতিহাসকার......বাঁচিয়েছেন।

অতিরিক্ত অনুশীলনী

৪। "তাঁরই অসমান্য বিজ্ঞান-প্রতিভার সাধনার জগতে জীবাণুতত্ত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।" (ক) তাঁর কাহার। (খ) কোন স্থানে, কোন সালের কোন তারিখে জন্ম? (গ) তিনি প্রথম জীবনে কি ছিলেন? (ঘ) কি ভাবেই বা তিনি জীব-বিজ্ঞানী হইলেন? (ঙ) পাস্তুরের কোন কাজ করিয়া দিয়া যান?

৫। (ক) ল্যাক্‌টিক অ্যাসিড ব্যাকটিরিয়া—কাহাদের নাম? (খ) কে এই নাম দেন? (গ) কাহারা তাহাকে কি কারণে লইয়া আসে? (ঘ) তিনি আসিয়া পরীক্ষা করিয়া কি দেখিলেন?

৬। (ক) জীবাণু-বিজ্ঞানীদের মধ্যে লুই পাস্তুর সন্দেহাতীতভাবে কোন সত্য প্রমাণ কর?

(খ) তাপের প্রভাবে ঐসব জীবণু ধ্বংস হয় কি?

(গ) কোন দিন হইতে চিকিৎসা জগতে এক নবযুগের স্থচনা হয়?

(ঘ) কাহার কোন তথ্যাবিষ্কারের ফলে ঐ স্থচনা হয়?

৭। "এ ব্যাপারে মানুষ পাস্তুরের আবিষ্কারের আগে ভাবতেই পারে নি।" ব্যাপারটা কি? নিজের কথায় বল।

৮। লিস্টার কে ছিলেন? (খ) তিনি কোথায় কি কাজে লিপ্ত ছিলেন? (গ) পাস্তুরের আবিষ্কার তাহাকে কি ভাবে সাহায্য করিয়াছিল?

৯। (ক) চিকিৎসাজগতে পাস্তুরের যুগান্তকারী আবিষ্কার কি?

(খ) তাহার পূর্বে অন্য কে ঐ ধরনের আবিষ্কার করেন?

১০। নিম্নলিখিত মন্তব্যগুলির মধ্যে কোন কোনটি সত্য বল।

(ক) শূন্য হইতেই জীবাণুর জন্ম।

(খ) শূন্য হইতে জীবাণুর জন্ম হয় না।

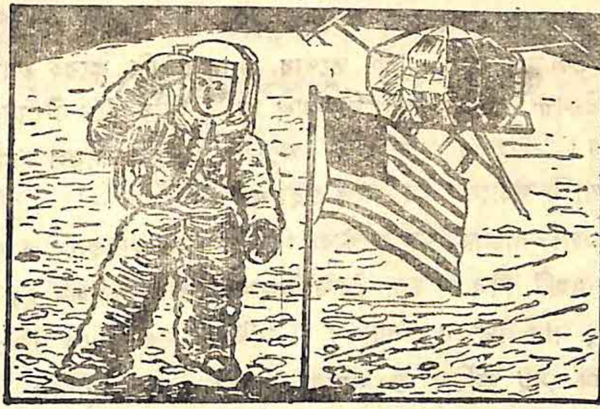
(গ) অনস্তিত্ব হইতে অস্তিত্বের সম্ভাবনা নাই।

১১। বিপরীত শব্দ লিখ:

প্রসিদ্ধ, জন্মগ্রহণ, ব্যাহত, সভ্যতা, জীবন, আরম্ভ, অদৃশ্য, অগোচর, আলো, সন্দেহাতীত।

চাঁদের দেশে

নির্মলচন্দ্র মাইতি



যুগ যুগ ধরে চাঁদ মানুষকে হাতছানি দিয়েছে, দাওয়ায় শুয়ে শুয়ে শিশু ঠাকুরমাকে গাইতে শুনেছে—

"আয় চাঁদ নড়িয়া
ভাত দিব বাড়িয়া
রাঙা সুতার কাপড় দিব···

শুনতে শুনতে শিশু ঘুমিয়ে পড়েছে। গানের শেষে ঠাকুরমা হয়ত দু'হাত জুড়ে প্রণাম জানিয়েছেন চাঁদকে, আবার দেশ-বিদেশের কবির দল চাঁদকে ঘিরে কত কল্পনার জাল বুনেছে তার শেষ নেই। শেষ নেই বৈজ্ঞানিকের চিন্তারও। রাতের পর রাত দূরবীন হাতে বৈজ্ঞানিক এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে পূর্ণিমার চাঁদের দিকে— ভেবেছে কী এক রহস্য আছে চাঁদের দেশে, ভেবেছে কোন্ মন্ত্রবলে পৌঁছানো যায় কল্পনার সেই অচিন রাজ্যে। তখনই রাশিয়া আর আমেরিকার বৈজ্ঞানিকরা স্মরণ করলেন নিউটনের সেই বিখ্যাত মাধ্যাকর্ষণ সূত্রকে। শুরু হল গবেষণা। তারা বিশ্বাস করলেন— এই গবেষণা বিজ্ঞান-জগতে নিয়ে আসবে এক বিরাট বিস্ময়।

হাউইবাজি নিজের আভ্যন্তরীণ শক্তিতে উর্ধ্বমুখী হয়। এর

ভেতরের বিস্ফোরক পদার্থকে জ্বালানির সাহায্যে জ্বালিয়ে দিলে, এর ভেতর সৃষ্টি হয় প্রচুর গ্যাস। সেই গ্যাস ছিদ্রপথে নিচের দিকে দ্রুতবেগে বেরোতে থাকলে তার প্রতিক্রিয়ায় গ্যাসটি প্রচণ্ড বেগে ঊর্ধ্বমুখী হয়। এই তথ্যের উপর ভিত্তি করেই রাশিয়া ও আমেরিকার বৈজ্ঞানিকগণ মহাকাশ পাড়ি দিয়ে চাঁদে যাওয়ার সংকল্প করলেন। একবার যদি সেই প্রচেষ্টা তাঁদের সফল হয়—তবে তাঁরা পাড়ি জমাবেন গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে।

১৯৫৭ সালের ৪ঠা অক্টোবর বিশ্ববিজ্ঞানের ইতিহাসে লাল অক্ষরে লেখা একটি দিন। রুশ বৈজ্ঞানিকগণ তৈরি করলেন একটি কৃত্রিম উপগ্রহ, নাম দিলেন স্পুটনিক। পৃথিবীর বুক থেকে ক্ষিপ্রগতিতে ছাড়লেন সেই কৃত্রিম উপগ্রহকে, চাঁদের মতই স্পুটনিক পরিক্রমা করছিল পৃথিবীর চারিদিকে, বহুবার পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে যখন মহাকাশ থেকে অক্ষতভাবে ফিরে এলো পৃথিবীর বুকে তখন বিশ্ববাসী বিস্মিত হল—আশান্বিত হল বৈজ্ঞানিক-সমাজ, প্রথম প্রচেষ্টা তাঁদের সার্থক, চন্দ্রাভিযানের প্রথম পদক্ষেপই শুভসূচনা।

আরম্ভ হল পরীক্ষা-নিরীক্ষা, মানুষকে পাঠানো কি সম্ভব হবে মহাকাশ অতিক্রম করে সেই চন্দ্রালোকে? মহাকাশযাত্রার সে ধকল কি সইতে পারবে জীবন্ত মানুষ? প্রথম পরীক্ষা শুরু হল এক সারমেয়কে দিয়ে, নাম তার 'লাইকা'। তার কোন পূর্বপুরুষ যুধিষ্ঠিরের স্বর্গযাত্রার সহগামী হয়েছিল কি-না জানা নেই; 'লাইকা' কিন্তু মহাকাশ পরিক্রমা করে ফিরে এসেছিল পৃথিবীর বুকে সম্পূর্ণ অক্ষতভাবে, তারপর মহাকাশ পরিক্রমায় প্রেরিত হয়েছিল দুটি বানর, তারও মহাকাশ পরিভ্রমণ করে ফিরে এসেছিল সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায়। তারপর শুরু হল মানুষের মহাকাশযাত্রা, ইতিহাসের একটি স্মরণীয় দিন—১৯৬১ সালের ১২ এপ্রিল রুশ বৈজ্ঞানিক ইউরি গ্যাগারিন ভোস্তাক নামক এক মহাকাশযানে গোটা পৃথিবীটা ঘুরে এলেন। মাত্র এক ঘণ্টা আটচল্লিশ মিনিটে। সম্পূর্ণ অক্ষতদেহে হাস্যমুখোজ্জ্বল ইউরি গ্যাগারিন যখন মহাকাশ পরিক্রমা করে

পদার্পণ করলেন পৃথিবীর মাটিতে, সমগ্র বিশ্ব উদ্বেল হয়ে উঠলো তাঁর অভিনন্দনে। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় একটি নাম চিহ্নিত হয়ে রইল চিরদিনের জন্য—ইউরি গ্যাগারিন। পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক-সমাজ উৎফুল্ল—আশান্বিত হয়ে উঠল ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার আশায়।

ইউরি গ্যাগারিনের এই মহাকাশ পরিক্রমা কিন্তু একদিনেই সার্থক হয়নি। তার জন্য প্রয়োজন হয়েছিল প্রভূত প্রস্তুতির—দীর্ঘদিনের অনুশীলন, বহু প্রকারের জটিল যন্ত্র সম্বলিত যান, এবং বিশেষ ধরনের পরিচ্ছদের প্রয়োজন হয়েছিল সে পরিক্রমায়। এই বিশেষ ধরনের পরিচ্ছদটির নাম 'স্পেস্ স্যুট'। মহাকাশ পরিক্রমার সময় দেহের বায়ুচাপ বাইরের চাপের চেয়ে বেশী হয়, তাতে শরীরটা ফেটে চৌচির হওয়ার সম্ভাবনা। ফলে শরীরের সমস্ত রক্তক্ষরণ অবশ্যম্ভাবী। তা ছাড়া মহাকাশের প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় শরীরের সমস্ত রক্ত জমে যাওয়াও অসম্ভব নয়, ফলে আরোহীর প্রাণহানি অনিবার্য। এই সমস্ত দিকে লক্ষ্য রেখেই ব্যয়সাধ্য এই পোশাক নির্মিত হয়।

রাশিয়ার এই বিজয় অভিযানের প্রশংসায় সমগ্র বিশ্ব যখন মুখর, আমেরিকাও কিন্তু তখন বসে নেই, দিনের পর দিন রাতের পর রাত চলেছে তার গবেষণা। কোটি কোটি ডলার ব্যয়িত হচ্ছে চঞ্চল হয়ে উঠেছে প্রস্তুতিতে। প্রথম চন্দ্রপৃষ্ঠে পদক্ষেপের গৌরব তার অর্জন করা চাই। বিরাট আকৃতির স্যাটার্ন-৫ রকেটের দ্বারা পরিচালিত হল এক মহাকাশযান অ্যাপলো। ৩ জন অভিযাত্রী নিয়ে ছুটে চললো অ্যাপলো-১১, প্রচুর উত্তপ্ত গ্যাস উদ্‌গিরণ করে উর্ধ্বগামী হল—তারপর আরম্ভ হল পৃথিবী পরিক্রমা। গতিবেগ হল প্রচণ্ড। সে গতিবেগের কাছে পরাভব স্বীকার করল মাধ্যাকর্ষণ শক্তি—ছুটে চললো অ্যাপলো আরও উঁচুতে—আরো-আরো। তার পরেই শেষ হল পৃথিবীর আকর্ষণ। প্রায় আড়াই লক্ষ মাইল পরিক্রমায় অ্যাপলো প্রবেশ করলো চন্দ্রলোকে—আকাশে। ঐ যে দেখা যায় চন্দ্রপৃষ্ঠে হাজার হাজার ছোটবড় গহ্বর, কী সুন্দর সেই দৃশ্য, কী রোমাঞ্চ তা দর্শনে—আনন্দ প্রকাশের ভাষা নেই। আবার

কয়েকবার পরিক্রমা করার পরই অ্যাপলোর গা থেকে ছোট একটি যান—"ঈগল" বিমুক্ত হয়ে ধীরে ধীরে স্পর্শ করল চাঁদের মাটি। বেরিয়ে এলেন মৃত্যুঞ্জয়ী বীর নীল আর্মস্ট্রং আর এডউইন এলড্রিন। সমস্ত পৃথিবীর মানুষ টেলিভিশনে দেখলো পৃথিবীর মানুষের প্রথম পদচিহ্ন চন্দ্রপৃষ্ঠে। মন্দিরে মন্দিরে গীর্জায় গীর্জায় সে দিন শঙ্খঘণ্টা বেজেছিল কিনা জানা নেই কিন্তু বিজ্ঞানের ইতিহাসে সেদিন—১৯৬৯ সালের ২০ জুলাই—নিশ্চয়ই এক নূতন যুগের সূচনা হয়েছিল।

পাঁচটি—দিন অনবরত চলেছে অ্যাপলো-১১, বৈমানিকেরা খেয়েছেন—ঘুমিয়েছেন—আবার গানও করেছেন, সামান্য সময়ের মধ্যেই কোথাও দেখেছেন সূর্য উদয়—কোথাও সূর্যাস্ত, কোথাও বা পৃথিবীকে দেখেছেন চাঁদের মতই গোলাকার। এমনি করে পাঁচ দিন পরে পদক্ষেপ করেছিলেন চন্দ্রপৃষ্ঠে, তাঁরা যে শিহরন অনুভব করেছিলেন সেদিন পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষ সে শিহরনের অংশীদার হয়েছিল। নামলেন তাঁরা চন্দ্রদেহে, নেই কোন জীবজন্তু, নেই কোন গাছপালা—নেই জল, নেই বায়ুমণ্ডল, শুধু ধূ ধূ করে বালুকাময় প্রান্তর।—আর ছোট বড় অসংখ্য পাথরের টুকরা। পাথরগুলি এই পৃথিবীর পাথরের মত। মাঝে মাঝে আগ্নেয়গিরির মুখের মত অসংখ্য গহ্বর, হাঁ করে বসে আছে। কোন উত্তাপ নেই। সেখানে তার পাশেই বড় ধূলার পাহাড়। কিন্তু সময় কম, প্রত্যেকটি মুহূর্তে নির্দেশ যাচ্ছে হিউস্টন মহাকাশ বন্দর থেকে—আর দেরী কোর না, চলে এসো। তাই মাত্র ২২ ঘণ্টা সেখানে কাটিয়ে প্রায় ৫৫ পাউণ্ড পাথর সংগ্রহ করে নেমে এলেন এই পৃথিবীতে। চন্দ্রে পদক্ষেপ করেই ক্ষান্ত হলেন না বৈজ্ঞানিকেরা। সেখানে হয়ত পাওয়া যাবে কোনো মূল্যবান ধাতু, যা মানবসমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করবে, সেখানে গড়ে উঠবে নতুন নতুন শহর—গড়ে উঠবে বিরাট জনপদ, এই আশাই করেছিলেন আমেরিকার বৈজ্ঞানিকেরা, তাই তিন মাসের মধ্যেই আরম্ভ করলেন দ্বিতীয় চন্দ্রাভিযান। এবারের নায়ক চার্লস কনরাড—

সহযাত্রী রিচার্ড গর্ডন আর আলেন বীন। অ্যাপলোর চালকের দায়িত্ব গর্ডর উপর. অ্যাপলো-১২ ছুটে চলল অভিযাত্রীদের নিয়ে, বিশ্ববাসী বিস্মিত হয়ে প্রতীক্ষা করল অভিযাত্রীদের নিরাপদ অবতরণের। তাঁরা ফিরে এলেন—সঙ্গে নিয়ে এলেন অসংখ্য উপাদান এবং প্রচুর অভিজ্ঞতা। সেখানকার পাথরই শুধু কুড়াননি এঁরা—নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন, জমি জরিপ করেছেন আর বসিয়ে এসেছেন এমন সব যন্ত্র যা মহাকাশযাত্রাকে করবে সহজ, সাবলীল। ৩১ ঘণ্টা চাঁদের বুকে কাটিয়ে ফিরে এলেন পৃথিবীর মাটিতে।

আবার শুরু হল যাত্রা। ১৯৭০ সালে ১৩ এপ্রিল অ্যাপলো-১৮-তে রওনা হলেন জেমস্ লোভেল, জন স্যুইং ফ্রেডারিক হেউজ, কিন্তু বিধি বাম, যান্ত্রিক গোলযোগের জন্যে তাঁরা ফিরে আসতে বাধ্য হলেন, কিন্তু হার মানলেন না।

এদিকে রাশিয়াও একাগ্র সাধনায় তার চন্দ্রাভিযানে ব্যস্ত। সে মানুষ পাঠাল না চন্দ্রগ্রহে, সে পাঠাল যন্ত্র-মানবকে। কতকগুলো স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র। তার কাজ শেষ করে সগৌরবে ফিরে এলো পৃথিবীর মাটিতে। বিশ্ববাসী বিস্মিত হল বিজ্ঞানের বিজয়-গৌরবে। তারপর মাত্র দু'মাসের মধ্যেই রাশিয়া পাঠালো 'লুনা'-১৭—তারই মধ্যে পাঠাল আট চাকার এক স্বয়ংক্রিয় ট্যাক্সি, বিশেষভাবে চাঁদের দেশের জন্যেই তৈরী। চন্দ্রলোক ঘুরে নানা দ্রব্যসম্ভার সংগ্রহ করে ট্যাক্সি ফিরে এলো দেশে। এইখানেই থেমে স্তব্ধ হয়নি রাশিয়া আর আমেরিকার মহাকাশযাত্রা। তাঁরা দিনের পর দিন অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন। মহাকাশে পাঠিয়েছেন কত অ্যাপলো, কত সোয়ুজ। তাঁরা অদূর ভবিষ্যতে পরিক্রমা করবেন কত গ্রহ-উপগ্রহ—আবিষ্কার করবেন কত প্রাণের স্পন্দন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এক নূতন পথ আবিষ্কৃত হয়ে বিজ্ঞানের জগতে আনবে এক নব রূপান্তর।

অনুশীলনী

১। মহাকাশে সর্বপ্রথম মহাকাশযান কে পাঠায়? সেই মহাকাশযানের বিষয় যাহা জান লিখ।

২। চন্দ্রপৃষ্ঠে কোন্ দেশের অধিবাসী প্রথম পদার্পন করেন? সেই অভিযানটি সংক্ষেপে লিখ।

৩। মহাকাশযাত্রীদের নিকট হইতে আমরা চন্দ্রপৃষ্ঠের যে বিবরণ পাইয়াছি তাহা বর্ণনা কর।

৪। রাশিয়ার চন্দ্রভিযানের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৫। টীকা লিখ :—

অ্যাপলো-১১ ; লুনা ; স্পুটনিক।

অতিরিক্ত অনুশীলনী

৬। (ক) আয় চাঁদ নড়িয়া
ভাত দিব বাড়িয়া
রাঙ্গা সূতার কাপড় দিব……

(ক) এই ছন্দটি কোন্ রচনা হইতে লওয়া হইয়াছে? (খ) কে, কাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া ইহা করিয়াছেন? (গ) এইরূপ আর কোন ছত্র জান কি?

(ঘ) জানা থাকিলে বল—আয় চাঁদ, আয়, আয়!
আয়, আয়, আয়—
চাঁদের কপালে চাঁদ
টিপ দিয়ে যা……

৭। "তাঁরা বিশ্বাস ক'রলেন—এই গবেষণা বিজ্ঞান জগতে নিয়ে আসবে এক বিরাট বিস্ময়।"

(ক) তাঁরা কাহারা? (খ) কোন্ বিষয়ে গবেষণা? (গ) নিউটনের সূত্র কি? (ঘ) কেন ঐ সূত্র স্মরণ করিলেন?

৮। "একবার যদি সেই প্রচেষ্টা তাঁদের সফল হয়—তবে তাঁরা পাড়ি জমাবেন গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে।"

(ক) কোন্ প্রচেষ্টার কথা বলা হইয়াছে? (খ) তাঁরা—কাহারা?
(গ) কোন্ দেশের বৈজ্ঞানিকেরা ঐ চেষ্টায় সফল হন?

৯। স্পুটনিক ও অ্যাপলো—কাহাদের নাম ?

১০। নিম্নলিখিত উদ্ধৃতিসমূহের যেগুলি সত্য সেগুলির পাশে (+) এই চিহ্ন এবং যেগুলি মিথ্যা সেগুলির পাশে (×) এই চিহ্ন দাও।

(ক) ইউরি গ্যাগারিন—একজন রুশ মহাকাশযাত্রী।

(খ) অ্যাপলো-১১ একখানি রুশ মহাকাশযান।

(গ) স্পুটনিক ভারতীয় মহাকাশযান।

(ঘ) আর্যভট্ট রুশীয় মহাকাশযান।

(ঙ) আর্যভট্ট রুশীয় উৎক্ষেপণ-কেন্দ্র হইতে আকাশমার্গে স্থাপন করা হয়।

১১। বন্ধনীর মধ্যের শুদ্ধ শব্দটি রাখিয়া ভুল শব্দটি কাটিয়া দাও।

(ক) আবার কয়েকবার পরিক্রমা করার পরই অ্যাপলোর গা থেকে ছোট একটি (যান/উপগ্রহ)—(লুনাঈগল) বিমুক্ত হয়ে ধীরে ধীরে স্পর্শ করল (চাঁদের/পৃথিবীর) মাটি।

(খ) (লাইকা/স্পুটনিক) কিন্তু মহাকাশ পরিক্রমা করে ফিরে এসেছিল পৃথিবীর বুকে সম্পূর্ণ অক্ষতভাবে।

জীবনসন্ধ্যায় রাণা প্রতাপ

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

স্থান—চিতোর সন্নিহিত জঙ্গল। কাল—সন্ধ্যা। প্রতাপসিংহ মৃত্যুশয্যায় শায়িত।

প্রতাপ—আমাকে এই শিবিরের বাহিরে একবার নিয়ে চল, মরবার আগে আমার চিতোর-দুর্গ একবার দেখে নিই।

গোবিন্দসিংহ কবিরাজের দিকে সপ্রশ্ন নয়নে চাহিলেন ; কবিরাজ কহিলেন—"ক্ষতি কি !"

সকলে মিলিয়া প্রতাপসিংহের পালঙ্ক বহিয়া দুর্গের সম্মুখে রাখিলেন। ইত্যবসরে গোবিন্দসিংহ জনান্তিকে কবিরাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বাঁচবার কোনও আসা নেই ?"

কবিরাজ—কোন আশাই নেই।

গোবিন্দ মস্তক অবনত করিলেন।

প্রতাপ শয্যায় অর্ধশায়িত হইয়া অদূরবর্তী চিতোর-দুর্গের পানে একদৃষ্টিতে চাহিয়া কহিলেন—"ঐ সেই চিতোর! ঐ সেই দুর্জয় দুর্গ, যা একদিন রাজপুতের ছিল। এই সেই চিতোর! যা উদ্ধার করব ভেবেছিলাম ; কিন্তু পারলাম না। কার্য প্রায় সমাধা করে এনে ছিলাম ; কিন্তু তার পূর্বেই দিবা অবসান হলো। কাজ অসম্পূর্ণ রয়ে গেল !"

পৃথ্বিরাজ—তার জন্য চিন্তা নেই, প্রতাপ ; সকল সময়ে কাজ একজনের দ্বারা সম্পন্ন হয় না, অসম্পূর্ণ থেকে যায় ; কখনও বা পিছিয়েও যায়। কিন্তু আবার একদিন সেই ব্রতের উপযুক্ত উত্তরাধিকারী আসে, সে সেই অসম্পূর্ণ কাজকে এগিয়ে দিয়ে যায়। ঢেউয়ের পর ঢেউ আসে, আবার পিছোয় ; সমুদ্র এইভাবে অগ্রসর হয়। কোন চিন্তা নাই।

প্রতাপ—চিন্তা থাকত না, যদি বীরপুত্র রেখে যেতে পারতাম।

"কিন্তু—ওঃ !" এই বলিয়া পার্শ্ব পরিবর্তন করিলেন।

গোবিন্দ—রাণাব কি অত্যধিক যন্ত্রণা হচ্ছে ?

প্রতাপ--হাঁ, যন্ত্রণা হচ্ছে। কিন্তু যন্ত্রণা দৈহিক নয়, গোবিন্দসিংহ! যন্ত্রণা মানসিক। আমার মনে হচ্ছে যে, আমার মৃত্যুর পরে একাজ আবার অনেক পিছিয়ে যাবে।

গোবিন্দ - কেন রাণা ?

প্রতাপ—আমার মনে হচ্ছে যে, আমার পুত্র অমরসিংহ বাদশাহী সম্মানের লোভে আমার পুনরর্জিত রাজ্য মোগলের হাতে সঁপে দেবে।

গোবিন্দ সে ভয়ের কোন কারণ নেই, রাণা।

প্রতাপ—কারণ আছে গোবিন্দসিংহ! অমর বিলাসী; এ দারিদ্র্যের বিষ সহ্য করতে পারবে না—তাই ভয় হয় যে, আমি মরে গেলে এ কুটিরের জায়গায়, প্রসাদ নির্মিত হয়ে, আর তোমরাও তার সে বিলাস-প্রবৃত্তির প্রশ্রয় দিবে।

গোবিন্দ—বাপ্পার নামে অঙ্গীকার করছি—তা কখনো হবে না।

প্রতাপ—তবে এখন আমি কতকটা নিশ্চন্ত হয়ে মরতে পারি।

পরে অমরসিংহের দিকে চাহিয়া কহিলেন—"অমরসিংহ। কাছে এস, আমি যাচ্ছি। শোন! যেখানে আমি আজ যাচ্ছি, সেখানে একদিন সকলেই যায়—কেঁদো না বৎস!—আমি তোমাকে একাকী রেখে যাচ্ছি না। আমি তোমাকে তাদের কাছে রেখে যাচ্ছি, যারা এতদিন সুখে, দুঃখে, পর্বতে, অরণ্যে, এই পঁচিশ বৎসর ধরে আমার পাশে দাঁড়িয়েছিল। তুমি যদি তাদের ত্যাগ না কর, তারা তোমাকে ত্যাগ করবে না। তারা প্রত্যেকেই প্রতাপসিংহের পুত্রের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত!—আমি তোমাকে সমস্ত মেবাররাজ্য দিয়ে যাচ্ছি—চিতোর দিয়ে যেতে পারলাম না, এই দুঃখ রইল। তোমাকে দিয়ে যাচ্ছি সেই চিতোর উদ্ধারের ভার, আর পিতার আশীর্বাদ—যেন তুমি সেই চিতোর উদ্ধার করতে পারো—আর দিয়ে যাচ্ছি এই নিষ্কলঙ্ক তরবারি—যার সম্মান, আশা করি, তুমি, উজ্জ্বল রাখবে। আর কি বলব, পুত্র! যাও, জয়ী হও, যশস্বী হও, সুখী হও। এই আমার আশীর্বাদ লও।"

অমরসিংহ পিতার পদধূলি লইলেন। প্রতাপসিংহ পুত্রকে আশীর্বাদ করিলেন। ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া পরে কহিলেন—"জগৎ অন্ধকার হয়ে আসে।—কণ্ঠস্বর জড়িয়ে আসে। অমরসিংহ, কোথায় তুমি!—এস, প্রাণাধিক! আরো কাছে এস!"

কবিরাজ নাড়ি দেখলেন। দেখিয়া বলিলেন—"রাণার মানব-লীলা শেষ হয়েছে। সৎকারের আয়োজন করুন।"

গোবিন্দ—পুরুষোত্তম! মেবারসূর্য! প্রিয়তম! তোমার চির-সঙ্গীকে ফেলে কোথায় গেলে!

বলিতে বলিতে মৃত রাণার চরণতলে লুণ্ঠিত হইলেন।

রাজপুত সর্দারগণ নতজানু হইয়া মৃত রাণার পদধূলি গ্রহণ করিলেন।

পৃথ্বী—যাও, বীর! তোমার পুণ্যার্জিত স্বর্গধামে যাও। তোমার কীর্তি রাজপুতের হৃদয়ে, মোগল হৃদয়ে, মানবজাতির হৃদয়ে চিরদিন অঙ্কিত থাকবে, ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত থাকবে; আরাবলির প্রতি চূড়ায়, সানুদেশে, উপত্যকায় জীবিত থাকবে, আর রাজস্থানের প্রতি ক্ষেত্রে, বন, পর্বত তোমার অক্ষয় স্মৃতিতে পবিত্র হয়ে থাকবে।

অনুশীলনী

১। প্রতাপসিংহ কে? তাঁহার সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

২। নাটকের ভাষায় লেখা এই রচনাটি নিজের ভাষায় বল।

৩। অর্থ লিখ :—রাণা, রাজপুত, মোগল ও মেবারসূর্য।

৪। ব্যাখ্যা :—(ক) কার্য প্রায়… … অসম্পূর্ণ রয়ে গেল, (খ) ঢেউয়ের পর … … অগ্রসর হয়।

অতিরিক্ত অনুশীলনী

৫। "জীবনসন্ধ্যায় রাণা প্রতাপ"—এই নাট্যাংশটুকু কোন মূল নাটক হইতে গৃহীত? (খ) উক্ত নাটকের নাট্যকারের নাম কি? ঐ নাট্যকারের অন্য একখানি নাটকের নাম কর। (গ) নাট্যাংশে বর্ণিত স্থানটি কোথায়?

৬। "ঐ সেই চিতোর!"

—কাহার উক্তি? চিতোর কি? চিতোর দুর্গ দেখিয়া বক্তার খেদোক্তির কারণ কি? উক্ত দুর্গ কাহাদের ছিল? বক্তার উক্তিকালে উহা কাহাদের অধিকারে ছিল?

৭। "ঢেউয়ের পর ঢেউ আসে, আবার পিছোয়, সমুদ্র এইভাবে অগ্রসর হয়।"

(ক) এই উদ্ধৃতিটি কোথা হইতে লওয়া হইয়াছে? (খ) এই উক্তিটি কাহার? (গ) কোন প্রসঙ্গেই বা এই উক্তি? (ঘ) কাহাকে লক্ষ করিয়াই বা কে এই উক্তি করিয়াছে? (ঙ) উক্তিটির বিষয়বস্তু পরিস্ফুট কর।

৮। "তার জন্য চিন্তা নেই।"—কাহার উক্তি? কাহাকে লক্ষ করিয়াই বা এই উক্তি? "তার" কথাটির প্রতিপাদ্য বস্তুটি কি?

৯। "আরো কাছে এস।"

কে কাহাকে কাছে আসিতে বলিতেছে? বক্তা কেন উক্ত ব্যক্তিকে আরও কাছে আসিতে বলিলেন? বিষয়টি ভাল করিয়া বল।

১০। (ক) পদান্তর কর:

জঙ্গল, সন্ধ্যা, সম্মুখ, সম্পূর্ণ, সম্মান, বিলাসী, অঙ্গীকার, নিস্তব্ধ, সূর্য, অক্ষয়, মুদ্রিত আয়োজন।

(খ) লিঙ্গান্তর কর:

শায়িত, অদূরবর্তী, রাজপুত, উত্তরাধিকারী, বাদশাহ, পুত্র, পিতা, নিষ্কলঙ্ক, প্রাণাধিক, পবিত্র, বিলাসী, চিরসঙ্গী।

(গ) বিপরীত শব্দ লিখ:

মরবার, ক্ষতি, সম্মুখে, আশা, অদূরবর্তী, হাঁ, বিশাল, নিশ্চিন্ত, মুখ, অর্জন, কীর্তি, জীবিত।

———

কবিতা

প্রার্থনা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল,
পূণ্য হউক, পূণ্য হউক. পূণ্য হউক, হে ভগবান ॥

বাংলার ঘর, বাংলার হাট, বাংলার বন, বাংলার মাঠ,
পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক, হে ভগবান ॥

বাঙালীর পণ, বাঙালীর আশা, বাঙালীর কাজ, বাঙালীর ভাষা,
সত্য হউক, সত্য হউক, সত্য হউক, হে ভগবান ॥

বাঙালীর প্রাণ, বাঙালীর মন, বাঙালীর ঘরে যত ভাইবোন,
এক হউক, এক হউক, এক হউক, হে ভগবান ॥

অনুশীলনী

১। এই কবিতায় কবি বাংলা ও বাঙালীর জাতির জন্য কি কি প্রার্থনা জানাইয়াছেন তাহা লিখ।

২। ব্যাখ্যা লিখ :

বাঙালীর প্রাণ...এক হউক, হে ভগবান।

অতিরিক্ত অনুশীলনী

৩। (ক) 'প্রার্থনা' কবিতাটি কাহার রচনা? (খ) কাহাদের জন্য কাহার এই প্রার্থনা? কেনই বা এই প্রার্থনা? আর কাহার কাছেই বা প্রার্থনা?

৪। "বাঙালীর প্রাণ ... ... হে ভগবান"—কোন্ কবিতা হইতে ইহা গৃহীত? ঐ কবিতা কোন কবির রচনা? কি বা কাহারা এক হইবে? কবি এ প্রার্থনা কেন বিশদভাবে বুঝাইয়া দাও।

৫। শূন্যস্থান পূরণ কর :

(ক) বাংলার—, —হাট, — বন, বাংলার — — হউক, পূর্ণ — — হউক, হে— ।

৬। কবিতাটির শেষ দুইটি ছত্র মুখস্থ বল।

পুণ্য হউক, সত্য হউক, পণ, পূর্ণ হউক।



একলব্যের গুরুভক্তি

কাশীরাম দাস

অর্জুনেরে সাথী করি আচার্য তখন।
উপনীত হ'ল যথা নিষাদ-নন্দন॥

একলব্য দ্রোণে দেখি প্রমাণ করিল।
কৃতাঞ্জলি হইয়া অগ্রেতে দাঁড়াইল॥

দ্রোণ বলিলেন যদি তুমি শিষ্য হও।
তবে গুরুদক্ষিণা মোরে আজি দাও॥

একলব্য বলে প্রভু মম ভাগ্যবশে।
কৃপা করি তুমি প্রভু এলে মম পাশে॥

সকল দ্রব্যেতে হয় গুরু-অধিকার।
যা কিছু আমার কাছে সকলি তোমার॥

আজ্ঞা কর প্রভু করিলাম অঙ্গীকার।
প্রাণ যদি চাও দিব শ্রীপদে তোমার॥

দ্রোণ বলিলেন যদি আমারে তুষিবা।
দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধ অঙ্গুলিটি দিবা॥

ততক্ষণে কাটিয়া অঙ্গুলি গোটা দিল।
গুরু-আজ্ঞায় অগ্র পশ্চাৎ না ভাবিল।

তুষ্ট হইলেন গুরু আর ধনঞ্জয়।
মনে জানিলেন গুরু আমারে সদয়॥

একলব্য-গুরুভক্তি দেখিয়া নয়নে।
স্বর্গ বইতে পুষ্পবৃষ্টি করে দেবগণে॥

অনুশীলনী

১। একলব্য কে ছিলেন ?

২। কেমন করিয়া দ্রোণ তাঁহার গুরু হইলেন ?

৩। দ্রোণ একলব্যকে কি বলিলেন ?

৪। একলব্য কি উত্তর দিলেন ?

৫। দ্রোণ কি চাহিলেন ?

৬। স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইল কেন ?

অতিরিক্ত অনুশীলনী

৭। "অর্জুনেরে সাথী করি আচার্য তখন।
উপনীত হল যথা নিষাদ নন্দন॥"

(ক) আচার্য কে ? নিষাদ-নন্দনই বা কে ? (খ) উক্ত পংক্তি দুইটি কোন কবিতার অন্তর্গত। কোন মূল গ্রন্থ হইতে উহা গৃহীত হইয়াছে। ঐ গ্রন্থের রচয়িতা কে ?

৮। "সকল দ্রব্যতে হয় গুরু-অধিকার।
যা কিছু আমার কাছে সকলি তোমার॥"

(ক) উক্তিটি কাহার। (খ) তোমার কথাটি কাহার প্রতি ব্যবহৃত হইয়াছে। (গ) কোন প্রসঙ্গে এই উক্তি করিয়াছেন। (ঘ) পংক্তি দুইটির অর্থ নিজের কথায় পরিস্ফুট কর।

৯। গুরু আজ্ঞায় অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিল।

(ক) কাহার সম্বন্ধে এই উক্তি। (খ) অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া সে কি করিল। (গ) ছাত্রটির অর্থ প্রসঙ্গ সহিত স্পষ্ট করিয়া বল।

১০। গদ্যরূপ লিখ—(ক) যথা, মম, মোরে, তুষিবা, এলে।

(খ) ধনঞ্জয় কাহার নাম ?

ধনকে জয় করিয়াছে ধনঞ্জয়।

ঐ রূপ বল তো—সমিতিকে জয় করিয়াছে যে সে——

সম্যাক্ জয় করিয়াছে যে সে——

(গ) শব্দার্থ লিখ—আচার্য, নিষাদনন্দন, উপনীত, ভাগ্যবলে, গুরু-দক্ষিণা, অধিকার, শ্রীপদে, সদয়, পুষ্পবৃষ্টি।

———

সখার প্রতি

স্বামী বিবেকানন্দ

ব্রহ্ম হ'তে কীট-পরমাণু, সর্ব ভূতে সেই প্রেমময় ;
মন প্রাণ শরীর অর্পন করো সখা এ সবার পায় ।
বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি' কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর ?
জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর ?

অনুশীলনী

১। স্বামী বিবেকানন্দ এই কবিতায় আমাদের কি উপদেশ দিয়েছেন ?

অতিরিক্ত অনুশীলনী

২। 'সখার প্রতি' কবিতাটি কোথা হইতে লওয়া হইয়াছে (**উত্তর—** 'বিবেকবাণী' হইতে)।

৩। প্রেমময় কে ? তাঁহাকে আমরা কিভাবে দেখিতে পাই ? কিভাবে তাঁহার সেবা করা যায় ?

৪। (ক) লিঙ্গান্তর কর—প্রেমময়, ঈশ্বর, ব্রহ্ম ।

(খ) পত্তরূপ লিখ—সবার, ছাড়ি, খুঁজিছে, সেবিছে ।

(গ) পদান্তর কর—শরীর, অর্পন, সম্মুখ, ঈশ্বর, জীব ।

— ০ —

তরুণ

গুরুসদয় দত্ত

বাংলা-মার দুর্নিবার আমরা তরুণ-দল
শ্রান্তিহীন ক্লান্তিহীন সঙ্কটে অটল ॥

গঙ্গা রাঢ়, পাল-রাজার বীর্য-গরিমা—
চণ্ডীদাস জয়দেবের ছন্দ-মহিমা—
ঢেউ তাঁদের দেয় মোদের চিত্তে নব বল ॥

নিঃস্বতার দৈন্যভার কর্‌ব উৎসাদন ;
অজ্ঞতার অন্ধকার কর্‌ব নির্বাসন ;
এই যুগের উন্মেষের জ্বাল্‌ব দীপ উজ্জ্বল ॥

সংযমের পৌরুষের পাল্‌ব প্রেরণা,
শ্রমযোগের উদ্‌যোগের সাধ্‌ব সাধনা ;
বাংলা-মা'র লাঞ্ছনার মুছ্‌ব আঁখিজল,
আমরা তরুণ-দল ॥

অনুশীলনী

১। বাংলার তরুণদলের সঙ্কল্প কি, তাহা লিখ।

২। অর্থ লিখ :—গঙ্গা-রাঢ়, পাল-রাজা, চণ্ডীদাস, জয়দেব।

অতিরিক্ত অনুশীলনী

৩। "বাংলা মা'র দুর্নিবার আমরা তরুণ দল।
শ্রান্তিহীন ক্লান্তিহীন সঙ্কটে অটল ॥"
—উদ্ধৃতিটুকু কোথা হইতে লওয়া হইয়াছে? কে এই কথা বলিয়াছে? কোন্ প্রসঙ্গেই বা এই উক্তি? পংক্তি দুইটির অর্থ সরল ভাষায় ব্যক্ত কর।

৫। "শ্রমযোগের উদ্‌যোগের সাধব সাধনা"।

—এই সংকল্প কাহাদের? শ্রমযোগ কি? উক্ত উদ্ধৃতিটি কোথা হইতে লওয়া হইয়াছে? পংক্তিটির তাৎপর্য বুঝাইয়া দাও।

৬। শব্দার্থ বল:

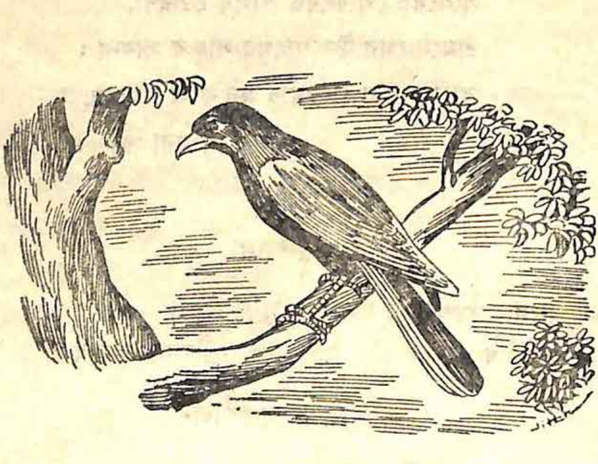
দুর্নিবার, সঙ্কটে, বীর্যগরীমা, নিঃস্বতা, দৈন্যতার, উৎসাদন, অজ্ঞতা, উন্মেষের, পৌরুষের, শ্রমযোগ, লাঞ্ছনা।

৭। বিপরীত শব্দ বল:

তরুণ, অটল, অজ্ঞ, অন্ধকার, নির্বাসন, অন্ধকার, উন্মেষ, উজ্জ্বল, সংযম পৌরুষ।

৮। দৈন্যতা পদটি ব্যাকরণদুষ্ট প্রয়োগ কি?

অাঁখিজল—এক কথায় কি বলা হয়?



স্বদেশ

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

জানো না কি জীব তুমি   জননী জনম-ভূমি
যে তোমার হৃদয়ে রেখেছে ;
থাকিয়া মায়ের কোলে   সন্তানে জননী ভোলে
কে কোথায় এমন দেখেছে।
ভূমিতে করিয়া বাস   ঘুমেতে পূরাও আশ
জাগিলে না দিবা বিভাবরী ;
কত কাল হরিয়াছ   এই ধরা ধরিয়াছে
জননী জঠর পরিহার'।
ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে   দেখ দেশবাসিগণে
প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া ;
কতরূপ স্নেহ করি   দেশের কুকুর ধরি,
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া।
স্বদেশের শাস্ত্রমতে   চলো সত্য-ধর্ম-পথে
সুখে করো জ্ঞান-আলোচন
পুষ্ট করো মাতৃভাষা   পুরাও মনের আশা,
দেশে করো বিদ্যা-বিতরণ।

অনুশীলনী

১। কবি 'স্বদেশ' কবিতায় স্বদেশের প্রতি আমাদের কি কর্তব্য:সাধন করিতে বলিয়াছেন, তাহা বর্ণনা কর।

২। ব্যাখ্যা কর : স্বদেশের শাস্ত্র মতে ... দেশে করো বিদ্যা বিতরণ।

অতিরিক্ত অনুশীলনী

৩। "ভূমিতে করিয়া বাস   ঘুমোতে পুরাও আশ
জাগিলে না দিবা বিভাবরী।"

—উক্তিটি কাহার? কোথা হইতে এই ছত্র কয়টি লওয়া হইয়াছে? জাগিলে না দিবা বিভাবরী— কাহার উদ্দেশ্যে এই উক্তি? কথাটির তাৎপর্য বুঝাইয়া দাও।

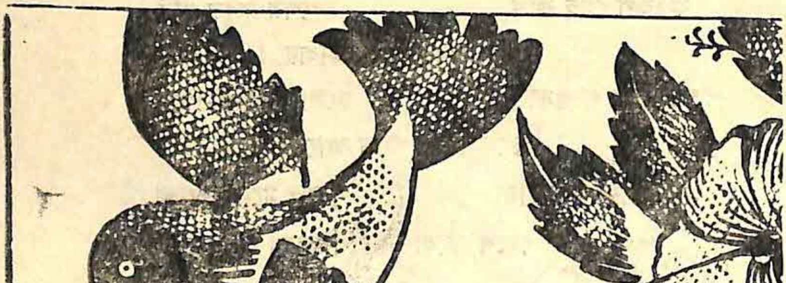
৪। নিম্নলিখিত উদ্ধৃতি দুইটি (১) কোথা হইতে লওয়া হইয়াছে? (২) কোন্ প্রসঙ্গে এই উক্তিগুলি করা হইয়াছে? (৩) উহাদের বক্তব্য বিষয় নিজের কথায় বল।

(ক) ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে দেখ দেশবাসিগণে
প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া ;
(খ) স্বদেশের শাস্ত্রমতে চলো সত্য-ধর্ম-পথে
সুখে কর জ্ঞান আলোচন।

৫। (ক) শব্দার্থ লিখ :—দিবা-বিভাবরী, জননী-জঠর, ভ্রাতৃভাব, প্রেমপূর্ণ শাস্ত্রমতে, জ্ঞান আলোচনা, বিদ্যাবিতরণ।

(খ) গদ্যরূপ লিখ :—জনমভূমি, আশ, হরিয়াছ, পরিহরি, জ্ঞান-আলোচন, পুরাও।

(গ) তিনটি করিয়া সমার্থক শব্দ লিখ :—ধরা, জননী, বিভাবরী, দিবা।



আমার সোনার বাংলা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি।
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
মরি হায় হায় রে—
ও মা, অঘ্রানে তোর ভরা ক্ষেতে কী দেখেছি মধুর হাসি।



কী শোভা কী ছায়া গো, কী স্নেহ কী মায়া গো—
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, কূলে কূলে।
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মরি হায়, হায় রে—
মা তোর বদনখানি মলিন হলে, ও মা, আমি নয়নজলে ভাসি।

তোমার এই খেলাঘরে শিশুকাল কাটিল রে—
তোমার ধূলামাটি অঙ্গে মাখি ধন্য জীবন মানি।
তুই দিন ফুরালে সন্ধ্যাকালে কী জ্বালিস্ ঘরে,
মরি হায়, হায় রে—
তখন খেলাধূলা সকল ফেলে, ও মা তোমার কোলে ছুটে আসি।
ধেনু-চরা তোমার মাঠে, পারে যাবার খেয়া ঘাটে,
সারাদিন পাখি-ডাকা ছায়ায় ঢাকা তোমার পল্লীবাটে
তোমার ধানে-ভরা আঙিনাতে জীবনের দিন কাটে,
মরি হায়, হায় রে—
ও মা, আমার ভাই তারা সবাই,
ও মা তোমার রাখাল তোমার চাষী।

অনুশীলনী

১। কবিতাটি আবৃত্তি কর।

২। কবি সোনার বাংলার কোন্ কোন্ মধুর দৃশ্যের বর্ণনা করিয়াছেন?

৩। ব্যাখ্যা কর :

(ক) আমার সোনার বাংলা ... বাজায় বাঁশি।

(খ) তুই দিন ফুরালে ... কোলে ছুটে আসি।

অতিরিক্ত অনুশীলনী

৪। "আমার সোনার বাংলা ...
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি।

(ক) এই উদ্ধৃতিটি কোথা হইতে গৃহীত। (খ) কাহার এই উক্তি? (গ) কবি কেন সোনার বাংলাকে ভালবাসেন? (ঘ) সোনার বাংলা বলার তাৎপর্য কি?

৫। "তুই দিন ফুরালে সন্ধ্যাকালে কী দীপ জ্বালিস ঘরে।"
—'তুই' কথাটি কাহার উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হইয়াছে? কেই বা এই উক্তি করিয়াছেন? ছত্রটির অর্থ পরিস্ফুট কর।

৬। "কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে।"

(ক) কোথা হইতে এই ছত্রটি লওয়া হইয়াছে?

(খ) কাহার এই উক্তি? (গ) কাহাকে উদ্দেশ্য করিয়াই বা এই উক্তি? (ঘ) বটের মূলে কোন্ ধরনের আঁচল বিছান হইয়াছে? নদীর কূলেই বা কোন্ শ্রেণীর আঁচল? নিজের কথায় বুঝাইয়া দাও।

৭। (ক) পদান্তর কর :
শোভা, স্নেহ, মায়া, মূল, মলিন, মাঠ সোনা, আকাশী।

(খ) গদ্যরূপ লিখ : তোমায়, ফাগুনে, বিছায়েছ, মাখি?

(গ) পাগলের ভাবকে বলা হয়—পাগলামি। ঐরূপ কী বলা হয় বল তো?

ছেলের ভাব ... বুড়োভাব ...
ন্যাকার ভাব ... জ্যাঠার ভাব ...

সুখ
কামিনী রায়



নাই কিরে সুখ ?   নাই কিরে সুখ ?
এ ধরা কি শুধু বিষাদময় ?
যাতনে জ্বলিয়া, কাঁদিয়া মরিতে
কেবলই কি নর জনম লয় ?

কাঁদাতেই শুধু বিশ্বরচয়িতা
সৃজিল কি নরে এমন করে ?
মায়ার ছলনে উঠিতে পড়িতে
মানব জীবন অবনী 'পরে ?

বল্ ছিন্ন বীণে বল্ উচ্চৈঃস্বরে,—
না, না, না, মানবের তরে
আছে উচ্চ লক্ষ্য, সুখ উচ্চতর,
না সৃজিলা বিধি কাঁদাতে নরে।

কার্যক্ষেত্র ওই প্রশস্ত পড়িয়া,
সমর-অঙ্গন সংসার এই,
যাও বীরবেশে করো গিয়ে রণ ,
যে জিনিবে, সুখ লভিবে সেই।

পরের কারণে স্বার্থ দিয়া বলি,
এ জীবন মন সকলি দাও,
তার মতো সুখ কোথাও কি আছে ?
আপনার কথা ভুলিয়া যাও।

পরের কারণে মরণেও সুখ,
'সুখ সুখ' করি কেঁদ না আর,
যতই কাঁদিবে, যতই ভাবিবে,
ততই বাড়িবে হৃদয়-ভার।

আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে
আসে নাই কেহ অবনী 'পরে !
সকলের তরে সকলে আমরা,
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।

অনুশীলনী

১। কবিতাটির মর্মার্থ সংক্ষেপে লিখ।

২। 'সুখ' কবিতাটির নামকরণের সার্থকতা লিপিবদ্ধ কর।

৩। ব্যাখ্যা লিখ :

(ক) পরের কারণে — ভুলিয়া যাও।

(খ) কাঁদাতেই — অবনী পরে ।

অতিরিক্ত অনুশীলনী

৩। "এ ধরা কি শুধু বিষাদময় ?"

(ক) কোথা হইতে ছত্রটি গৃহীত ? (খ) কে, কেন এই কথা বলিয়াছেন ? (গ) সংসার কি শুধুই দুঃখময় ? না এখানে সুখও আছে ? যদি থাকে তবে সে সুখ কোথায় ?

৫। "বল্ ছিন্ন বীণে, বল উচ্চৈঃস্বরে—"

'ছিন্ন বীণে' বলার গূঢ় অর্থ কি ? ছিন্ন বীণায় কোন্ সুর বাজিতে কবির আহ্বান ? কেনই বা কবির এ আহ্বান ?

৬। নিম্নলিখিত উদ্ধৃতি দুইটির (১) প্রসঙ্গ নির্দেশ কর, (২) উহাদের অন্তর্নিহিত অর্থ পরিস্ফুট কর।

(ক) পরের কারণে মরণেও—আর।

(খ) সকলের তরে সকলে—পরের তরে।

৭। (ক) বিপরীত শব্দ লিখ: সুখ, বিষাদময়, উচ্চ, জনম, সৃষ্টি, প্রশস্ত, স্বার্থ, মরণ, পরের।

(খ) লিঙ্গান্তর কর: বিষাদময়, বিশ্বরচয়িতা মানব, নর, বীর।

(গ) বাক্য গঠন কর: ছিন্ন, লক্ষ্য, সমর-অঙ্গন, সংসার, স্বার্থ, বিব্রত।

অমৃত-কণা

রজনীকান্ত সেন

বৃথা দর্প

নর কহে,—"ধূলি-কণা, তোর জন্ম মিছে ;
চিরকাল প'ড়ে র'লি চরণের নীচে।"
ধূলি-কণা কহে—"ভাই, কেন কর ঘৃণা ?
তোমার দেহের আমি পরিণাম কি না ?"
মেঘ বলে,—সিন্ধু, তব জনম বিফল,
পিপাসায় দিতে নার' একবিন্দু জল।"
সিন্ধু কহে, "পিতৃনিন্দা কর কোন্ মুখে ?
তুমিও অপেয় হবে পড়িলে এ বুকে।"

স্বাধীনতার সুখ

বাবুই পাখিরে ডাকি' বলিছে চড়াই,—
"কুঁড়ে ঘরে থেকে কর শিল্পের বড়াই।
আমি থাকি মহাসুখে অট্টালিকা' 'পরে,
তুমি কত কষ্ট পাও রোদ বৃষ্টি, ঝড়ে।"
বাবুই হাসিয়া কহে,—"সন্দেহ কি তায় ?
কষ্ট পাই, তবু থাকি নিজের বাসায় ;
পাকা হোক্, তবু ভাই, পরের ও বাসা ;
নিজ হাতে গড়া মোর কাঁচা ঘর খাসা।"

অনুশীলনী

১। বৃথা দর্প ও স্বাধীনতার সুখ কবিতা দুইটি পড়িয়া কি শিক্ষা লাভ করিলে ?

২। ব্যাখ্যা লিখ : নর কহে—পরিণাম কি না ?

অতিরিক্ত অনুশীলনী

৩। 'বৃথা দর্প' ও 'স্বাধীনতার সুখ'—এই কবিতা দুইটি কাহার রচনা? এই দুইটি কবিতার একটিমাত্র শিরোনাম 'অমৃত-কণা দেওয়া হইয়াছে—এই নামকরণের সার্থকতা আছে কি? নিজের ভাষায় সার্থকতা দেখাও।

৪। (ক) "তোমার দেহের আমি পরিণাম কি-না?"

—তোমার কাহার? আমি কে? দেহের পরিণাম সম্বন্ধে এই উক্তি সত্য কি? সত্যটি পরিস্ফুট কর।

(খ) "পিতৃনিন্দা কর কোন্‌মুখে?"

—কে কাহার পিতা? পুত্রের মুখে কি পিতৃনিন্দা শুনিয়া পিতার ঐ উক্তি? পিতাই বা পুত্রকে কি উত্তর দিয়াছেন? সিন্ধু কি প্রকারে মেঘের পিতৃত্ব দাবি করিয়াছে?

৫। "আমি থাকি মহাসুখে অট্টালিকা পরে।"

—আমিকে? কাহাকে উদ্দেশ্যে করিয়া বক্তার ঐ উক্তি? উদ্দিষ্ট পাখি কোথায় থাকে? সে কোন্ শিল্পের বড়াই করে?"

৬। "নিজ হাতে গড়া মোর কাঁচা ঘর খাসা।"

—কাহার উক্তি? কাহার উদ্দেশ্যে বক্তার কেন এই উক্তি? এই কথা কয়টি বলিয়া বক্তা কোন্ সত্য প্রতিপাদন করিতে চাহিয়াছে?

৭। নিম্নলিখিত শব্দযুগের অর্থ-পার্থক্য দেখাও:

চির ও চীর, কুঁড়ে ও কুড়ে, স্বর ও শর।

৮। পদান্তর কর:

কাল, দেহ, সিন্ধু, পিপাসা, নিন্দা, ঘৃণা, সন্দেহ, মেঘ।

(খ) বিপরীত শব্দ লিখ:

অমৃত, চিরকাল, নার, নিন্দা, অপেয়, মহাসুখ, সন্দেহ, নিজের।



জন্মভূমির প্রতি

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

রেখো মা দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে।
সাধিতে মনের সাধ
ঘটে যদি পরমাদ,
মধুহীন ক'রো না গো তব মনঃ-কোকনদে॥
প্রবাসে দৈবের বশে
জীবতারা যদি খসে
এ দেহ-আকাশ হ'তে, নাহি খেদ তাহে।

জন্মিলে মরিতে হবে,
অমর কে কোথা কবে ?
চিরস্থির কবে নীর, হায় রে জীবন-নদে ?
কিন্তু যদি রাখ মনে
নাহি মা ডরি শমনে
মক্ষিকাও গলে না গো পড়িলে অমৃত-হ্রদে।
সেই ধন্য নরকূলে
লোকে যারি নাহি ভুলে,
মনের মন্দিরে নিত্য সেবে সর্বজন।
কিন্তু কোন্ গুণ আছে
যাচিব যে তব কাছে
হেন অমরতা আমি, কহ গো শ্যামা জন্মদে।

তবে যদি দয়া কর
ভুল দোষ, গুণ ধর,
অমর করিয়া বর দেহ দাসে সুবরদে।
ফুটি যেন স্মৃতিজলে
মানসে, মা, যথা ফলে
মধুময় তামরস, কি বসন্তে কি শরদে ॥

অনুশীলনী

১। কবিতাটির সারাংশ লিখ।

২। ব্যাখ্যা কর:

(ক) রেখো মা দাসেরে … মনঃ-কোকনদে।

(খ) প্রাবাসে দৈবের বশে……জীবন-নদে ?

(গ) কিন্তু যদি……অমৃত-হ্রদে ?

(ঘ) ফুটি যেন……কি শরদে।

৩। ব্যাস-বাক্য সহ সমাস লিখ:

মনঃ-কোকনদে, জীবন নদ, সুবরদে।

অতিরিক্ত অনুশীলনী

৪। "রেখো মা দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে।"

—'মা' কে? দাসই বা কে? 'মিনতি' কি? কার পদেই বা মিনতি?

৫। "মধুহীন করো না গো তব মনঃ কোকনদে।"

—'মধুহীন' কথাটির তাৎপর্য বুঝাইয়া দাও। 'কোকনদ' কোন শ্রেণীর ফুল? ঐ শ্রেণীর নীল ও সাদা ফুলের নাম কি কি?—(শ্বেতপদ্ম, কুণ্ডরীক, নীলপদ্ম, ইন্দীবর)।

৬। "এ দেহ আকাশে হতে নাহি খেদ তাহে।"

—কাহার উক্তি? দেহ আকাশ কেন বলা হইল? 'জীবতারা' কথার অর্থ কি? এই উপমাটির অর্থ সহজ কথায় বুঝাইয়া বল।

৭। "চিরস্থির কবে নীর, হায় রে, জীবন নদে ?

—এই পংক্তিটি কোথা হইতে লওয়া হইয়াছে ? কেই বা একথা কোন্ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন। কথাটির বক্তব্য বিষয় স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দাও।

৮। "নাহি মা ডরি শমনে—"

—শমন কি ? তাহাকে ভয় না করিবার কারণ কি ? 'মা' উদ্দেশ্যে কাহার এই নির্ভীক উক্তি ?

৯। "মানসে, মা' যথা ফলে
মধুময় তামরস, কি বসন্তে কি শরদে ॥"

'মানসে' ও 'মধুময়' কথা দুইটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ—এখানে যে যে অর্থে উহারা ব্যবহৃত তাহা বিশদভাবে বুঝাইয়া দাও।

১০। (ক) শব্দার্থ বল :

মিনতি, পরমাদ, মনঃ-কোকনদ, জীবতারা, দৈবের বশে, চিরস্থির, অমৃত হ্রদে, নরকুলে, অমরতা, শ্যামা জন্মদে, সুবরদে,স্মৃতিজলে, তামরস।

(খ) গদ্যরূপ লিখ :

সাধিতে, পরমাদ, ডরি, সেবে, যাচিব, দেহ।



ধাত্রী পান্না

যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়

[ধাত্রী পান্না শিশু উদয়সিংহকে রক্ষা করিবার জন্য নিজ শিশু পুত্রকে বলি দিয়াছেন। এই কাহিনী ইতিহাস প্রসিদ্ধ। পান্নার অন্তরস্থিত মাতার স্নেহ-ধর্ম এবং রাজপুত নারীর বীরধর্ম—উভয়ের সুন্দর পরিচয় এই কবিতায় রহিয়াছে।]

দশ মাস গর্ভে তোরে করেছি ধারণ
স্নেহের পুতলি তুই, তুলি তোরে বুকে
করায়েছি স্তন্যপান, লালন পালন,
কত যে করেছি, নিজে কি বলিব মুখে ?
সমুদ্রের পার আছে, তল আছে তার—
অতল অপার মাতৃস্নেহ-পারাবার।
বাঘিনী রুধির-পানে নিয়ত লোলুপা,
আপন সন্তানে তারো অপার মমতা ;

পরভৃতঘাতিনী পুতনা গোপীরূপা
নিজপুত্রে স্তন্যদানে করেনি খলতা ;
বাঘিনী, রাক্ষসী বড় নির্দয় জগতে,
তারা কিন্তু শতগুণে ভাল আমা হ'তে।
হায় বৎস! এ বীভৎস কার্য-সম্পাদনে
পাপীয়সী পান্না বই সাধ্য আর কার?
পরলোকগত পতি, তাঁর স্থাপ্য ধনে
ডাকাতি করিতে আজি প্রবৃত্তি আমার।
পতিকুলে দিতে পাপ! নিবাপ-অঞ্জলি,
কেহ না রহিবে তোরে যমে দিলে বলি।
কেন রে অজস্র অশ্রু হৃদি-বজ্রসারে
পড়িস্ রহিয়া, পান্না পাসরিবে স্নেহ।
'অশ্বত্থামা হত' এই মিথ্যা সমাচারে
কুরুক্ষেত্র-রণে দ্রোণ ত্যজিলেন দেহ।
মহারথ তিনি তবু বাৎসল্যের দাস
নারী হ'য়ে বীরধর্ম করিব প্রকাশ।
স্বার্থত্যাগ মহামন্ত্রে দীক্ষা যার আছে,
কঠোর বীরের ধর্ম পালে যেই জনে,
আত্মপরিজন স্নেহ তুচ্ছ তার কাছে,
স্থির লক্ষ্য একমাত্র সঙ্কল্প সাধনে।
ভীরুতা মমতা দু'য়ে নিকট সম্বন্ধ,
কাপুরুষ ক্ষুদ্রচেতা সদা স্বার্থে অন্ধ।
কুল-পাংশুলার গর্ভে জনম যাহার
সেই দাসী-পুত্র হবে মেবারের রাজা?
খদ্যোতে হরিয়া লবে দ্যুতি চন্দ্রমার?
মৃগেন্দ্র-বিক্রমে বনে বিচরিবে অজা?

অসুরে অমৃত-ভাণ্ড করিবে হরণ ?
কুক্কুরে যজ্ঞের হবিঃ করিবে লেহন ?
এস পুত্র! পরাইব রত্ন-আভরণ,
সাজাব তোমারে স্বর্ণ-খচিত সুবেশে,
পালঙ্কের অঙ্কে তোমা' করিয়া স্থাপন
কাঁপাব চামর-বাতে কাকপক্ষ কেশে।
নির্জল নিশ্চল নেত্রে চা'ব মুখপানে,
যাবৎ না হও ছিন্ন ঘাতক কৃপাণে।
পালাও উদয়সিংহ, সিংহের শাবক,
শৃগালের বৃত্তি এবে আশ্রয় তোমার,
জ্বলিবে যখন তব পৌরুষ-পাবক,
উৎপাত-পতঙ্গ পুড়ে হবে ছারখার।
ঢাকুক প্রভাত-রবি কুহেলি-তিমির
অচিরে প্রদীপ্ত তেড়ে উদিবে মিহির।

অনুশীলনী

১। ধাত্রী পান্নার মহৎ চরিত্র সংক্ষেপে লিখ।

ব্যখ্যা কর—

(ক) 'অশ্বত্থামা হত' এই মিথ্যা সমাচারে——বীরধর্ম কবির প্রকাশ।

(খ) স্বার্থত্যাগ মহামন্ত্রে——সদা স্বার্থে অন্ধ।

৩। অর্থ লিখ—

পুতনা, দ্রোণাচার্য, অশ্বত্থামা, উদয়সিংহ, খদ্যোতে হরিয়া লবে দ্যুতি চন্দ্রমার ? পরসুতঘাতিনী, নিবাপ, পাসরিবে, মৃগেন্দ্র, অজা, হবিঃ, কৃপাণ, তিমির, মিহির।

অতিরিক্ত অনুশীলনী

৪। "সমুদ্রের পার আছে ; তল আছে তার—
অতল অপার মাতৃস্নেহ পারাবারে।"

—উক্তিটি কাহার ? কোন্ প্রসঙ্গে এই উক্তিটি করা হইয়াছে ? এই বক্তব্যের অন্তরালে যে প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত আছে তাহা পরিস্ফুট কর।

৫। "তারা কিন্তু শতগুণে…ভাল আমা হতে।"

—তারা কাহারা? কোন্ গুণে তাহারা ভাল? উক্তিকারিণী কেন এই খেদোক্তি করিলেন?

৬। "পতিকুলে দিতে বাপ! নিবাপ-অঞ্জলি,
কেহ না রহিবে তোরে যমে দিলে বলি!"

—কে কাহাকে বাপ বলিয়া সম্বোধন করিয়াছে? "নিবাপ অঞ্জলি" —কথাটার অর্থ কি? 'তোকে' কাহাকে? 'যম' কে? যম দিলে বলি—কথা কয়টির অর্থ বুঝাইয়া বল।

৭। "অশ্বত্থামা হত এই মিথ্যা সমাচারে—"

—এই মিথ্যা সমাচার কোথায়, কখন রটিয়াছিল আর তাহার পরিণতিই বা কি হইয়াছিল? এখানে সে প্রসঙ্গে উত্থাপনের তাৎপর্য কি?

৮। খদ্যোতে হরিয়া লবে দ্যুতি চন্দ্রমার?"

—কোথা হইতে এই উপমাটি লওয়া হইয়াছে? খদ্যোত কি? চন্দ্রমাই বা কি? এখানে খদ্যোত ও চন্দ্রমা কথা দুইটি দ্বারা কে কে উপলক্ষিত হইয়াছে? এই উপমার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

৯। "ঢাকুক প্রভাত-রবি কুহেলি তিমির
অচিরে প্রদীপ্ত তেজে উদিবে মিহির।"

—প্রসঙ্গ নির্দেশ করিয়া অর্থ পরিস্ফুট কর।

১০। (ক) নিম্নলিখিত শব্দ-যুগলের অর্থ বুঝাইয়া এক একটি বাক্য রচনা কর:— স্বার্থ ও সার্থ, লক্ষ্য ও লক্ষ, কুল ও কূল।

(খ) গদ্যরূপ লিখ:—

তারো, তারা, আমা, কার, তাঁর ত্যাজিলেন, যার, হরিবে, তোমা, চা'ব, উদিবে।

———

বঙ্গ আমার

দ্বিজেন্দ্র লাল রায়

বঙ্গ আমার! জননী আমার! ধাত্রী আমার! আমার দেশ।
কেন গো মা তোর শুষ্ক বদন, কেন গো মা তোর রুক্ষ কেশ।
কেন গো মা তোর ধূলায় আসন, কেন গো মা তোর মলিন বেশ।
সপ্তকোটি সন্তান যার ডাকে উচ্চে—"আমার দেশ!"
কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য, কিসের লজ্জা, কিসের ক্লেশ!
সপ্তকোটি মিলিত কণ্ঠে ডাকে যখন—"আমার দেশ!"

উদিল যেখানে বুদ্ধ আত্মা মুক্ত করিতে মোক্ষদ্বার,
আজিও জুড়িয়া অর্ধ জগৎ ভক্তি-প্রণত চরণে যাঁর!
অশোক—যাঁহার কীর্তি ছাইল গান্ধার হ'তে জলধি শেষ,
তুই কি না মাগো তাঁদের জননী, তুই কি না মাগো তাঁদের দেশ।
কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য, কিসের লজ্জা, কিসের ক্লেশ।
সপ্তকোটি মিলিত কণ্ঠে ডাকে যখন—"আমার দেশ!

একদা যাহার বিজয় সেনানী হেলায় লঙ্কা করিল জয়
একদা যাহার অর্ণব পোত ভ্রমিল ভারত-সাগর-ময়;
সন্তান যার তিব্বত-চীন-জাপানে গঠিল উপনিবেশ,
তার কি না এই ধূলায় আসন, তার কিনা এই ছিন্ন বেশ।
কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য, কিসের লজ্জা, কিসের ক্লেশ!
সপ্তকোটি মিলিত কণ্ঠে ডাকে যখন—"আমার দেশ!"

উদিল যেখানে মুরজ মন্ত্রে নিমাই-কণ্ঠে মধুর তান,
ন্যায়ের বিধান দিল রঘুমণি, চণ্ডীদাস গাইল গান;
যুদ্ধ করিল প্রতাপাদিত্য, তুই ত মা সেই ধন্য দেশ!
ধন্য আমরা যদি এ-শিরায় থাকে তাঁদের রক্তলেশ!
কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য, কিসের লজ্জা, কিসের ক্লেশ!
সপ্তকোটি মিলিত কণ্ঠে ডাকে যখন—"আমার দেশ!"

অনুশীলনী

১। "বঙ্গ আমার" কবিতায় কবি বাংলাদেশের অতীত গৌরবের যে কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন তাহা লিখ।

২। ব্যাখ্যা কর :

(ক) অশোক—যাঁহার…তাঁহার দেশ ?

(খ) একদা যাহার বিজয় সেনানী…ভারত-সাগর-ময়।

(গ) উদিল যেখানে…রক্তলেশ।

৩। অর্থ লিখ :

বুদ্ধ, অশোক, নিমাই, চণ্ডীদাস, প্রতাপাদিত্য, গান্ধার, অর্ণব, মুরজ, মন্ত্র।

অতিরিক্ত অনুশীলনী

৪। সপ্তকোটি মিলিত কণ্ঠে ডাকে যখন—"আমার দেশ"।

—এই পংক্তিটি কোন্ কবিতার অন্তর্গত ? কবিতাটি কাহার রচনা ? এইটি কোন্ শ্রেণীর কবিতা ? সপ্তকোটি কণ্ঠ বলিতে কবি কি অর্থ করিয়াছেন ?

"উদিল যেখানে বুদ্ধ আত্মা মুক্ত করিতে মোক্ষদ্বার,"

—বুদ্ধ আত্মা কি ? মোক্ষদ্বার কথার অর্থই বা কি ? উক্ত উদ্ধৃতিটি কোন্ কবিতা হইতে গৃহীত ? উদ্ধৃতিটির অর্থ পরিস্ফুট কর।

৬। "অশোক—যাঁহার কীর্তি ছাইল গান্ধার-হ'তে জলধি-শেষ,
তুই কি না মাগো তাঁদের জননী, তুই কি মাগো তাঁদের দেশ ?"

—যাঁহার—কাহার ? —গান্ধার হ'তে জলধি-শেষ বেলার অর্থ কি ? 'মা' শব্দে কাহাকে উপলক্ষিত করা হইয়াছে ? তাঁদের কাহাদের ?

৭। একটি কথায় উত্তর দাও :

(ক) একদা কাহার বিজয়-সেনানী হেলায় লঙ্কা জয় করিল ?

(খ) কাহার অর্ণব পোত ভারত-সাগর ময়ধ ভ্রমণ করিল ?

(গ) কাহারা তিব্বত চীন ও জাপান উপনিবেশ গড়িল ?

(ঘ) রঘুমণি কিসের বিধান দিলেন ?

(ঙ) চণ্ডীদাস কিসের গান গাহিলেন ?

৮। জলধারণ করে যে তাহাকে বলে—জলধি। ঐরূপ কি হইবে বল তো ?

উদক ধারণ করে যে———

পয়ঃ ধারণ করে যে———

৯। বিপরীত শব্দ বল :

শুষ্ক, কীর্তি, শেষ, দুঃখ, বিজয়, জল, পোত, মিলিত।

১০। পদান্তর কর :

দেশ, বঙ্গ, ক্লেশ, দৈন্য, আত্মা ভক্তি, প্রণত কীর্তি, মিলিত, জয়, ভারত, উপনিবেশ, কণ্ঠ।

জীবন সঙ্গীত

হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়

ব'লো না কাতর স্বরে বৃথা জন্ম এ সংসারে
এ জীবন নিশার স্বপন !

দারা পুত্র পরিবার তুমি কার, কে তোমার
—ব'লে জীব ক'রো না ক্রন্দন।

মাণবজনম সার এমন পাবে না আর,
বাহ্য দৃশ্যে ভুল' নারে মন ;

কর যত্ন হবে জয়, জীবাত্মা অনিত্য নয়,
ওহে জীব কর আকিঞ্চন।

ক'রো না সুখের আশ প'রো না দুঃখের ফাঁস,
জীবনের উদ্দেশ্য তা নয় ,

সংসারে সংসারী সাজ, কর নিত্য নিজ কাজ,
ভবের উন্নতি যাতে হয়।

দিন যায়, ক্ষণ যায়, সময় কাহারো নয়,
বেগে ধায় নাহি রয় স্থির ;

সহায়, সম্পদ, যশ, সকলি কালের বশ ।
আয়ু যেন পদ্মপত্রে নীর।

সংসার-সমরাঙ্গনে, যুদ্ধ কর দৃঢ়পণে
ভয়ে ভীত হ'য়ো না মানব,

কর কার্য বীর্যবান,   যায় যাবে যাক্ প্রাণ
মহিমাই জগতে দুর্লভ।

মনোহর মূর্তি হেরে,   ওহে জীব! অন্ধকারে
ভবিষ্যতে ক'রো না নির্ভর;

অতীত সুখের দিনে,   পুনঃ আর ডেকে এনে,
চিন্তা ক'রে হ'য়ো না কাতর।

সাধিতে আপন ব্রত,   স্বীয় কার্যে হও রত,
একমনে ডাক ভগবান;

সঙ্কল্প সাধন হবে,   ধরাতলে কীর্তি রবে,
সময়ের সার—বর্তমান!

মহাজ্ঞানী মহাজন,   যে পথে ক'রে গমন,
হয়েছেন প্রাতঃস্মরণীয়;

সেই পথ লক্ষ্য ক'রে   স্বীয় কীর্তি ধ্বজা ধ'রে
আমরাও হব বরণীয়।

সমর-সাগর তীরে,   পদাঙ্ক অঙ্কিত ক'রে
আমরাও হব হে অমর।

সেই চিহ্ন লক্ষ্য ক'রে   অন্য কোন জন পরে
যশোদ্বারে যাইবে সত্বর।

ক'রো না মানবগণ   বৃথা ক্ষয় এ জীবন
সংসার সমরাঙ্গন মাঝে;

সঙ্কল্প রয়েছে যাহা,   সাধন করহ তাহা
রত হয়ে নিজ নিজ কাজে।

অনুশীলনী

১। কবিতাটি পর পর আট লাইন মুখস্থ লিখ।

২। এই কবিতায় মনুষ্য-জীবনের যে উদ্দেশ্যের কথা বর্ণিত হইয়াছে তাহা লিখ।

৩। কবিতাটি পাঠ করিয়া কি শিক্ষা লাভ করিলে ?

৪। ব্যাখ্যা লিখ : (ক) দিন যায়, ক্ষণ যায়······আয়ু যেন পদ্মপত্রে নীর।

(খ) ক'রো না মানবগণ......রত হয়ে নিজ নিজ কাজে।

অতিরিক্ত অনুশীলনী

৫। 'জীবনসঙ্গীত' — কবিতাটি কাহার রচনা ? উহা তাঁহার মৌলিক কবিতা কি ? যদি না হয়, তবে কোন্ কোন্ কবির, কোন কবিতার ছায়া লইয়া (অনুবাদ) লিখিত ? (শেষ অংশের উত্তর—বিদেশী কবি Long Fellow-এর Psalm of life কবিতার বাংলা তর্জমা—প্রথম পংক্তি 'Tell me not in mournful numbers...

৬। "মানবজনম সার এমন পাবে না আর
বাহ্যদৃশ্যে ভুল' না রে মন।"

(ক) কোন্ মানসিক অবস্থার পরিপেক্ষিতে কবির এই উক্তি ?

(খ) বাহ্যদৃশ্যে বলিতে কবি কি বলিয়াছেন ?

(গ) কেনই বা 'না ভুলিবার' জন্য উপদেশ দিয়াছেন ?

৭। (ক) কবির মতে জীবনের উদ্দেশ্য কি ? নিজের কথায় বল।

(খ) আয়ুকে পদ্মপত্রে নীরের সঙ্গে কেন তুলনা করা হইল ?

(গ) জগতে দুর্লভ বস্তু কি ?

(ঘ) ধরাতলে কি ভাবে কীর্তি রাখা যায় ?

৮। "সেই চিহ্ন লক্ষ্য করে...সত্বর।"

(ক) সেই চিহ্ন কোন্ চিহ্ন ?

(খ) কোথায় কাহারা সেই চিহ্ন রাখিয়া যাইবে ?

(গ) কি ভাবেই বা ঐ চিহ্ন রাখা যায় ?

৯। (ক) দিন যায়···পদ্মপত্রে নীর।

(খ) মহাজ্ঞানী···বরণীয়।

—উক্ত উদ্ধৃতি দুইটি কোন্ কবিতার অন্তর্গত ? কোন্ প্রসঙ্গে উহাদের বলা হইয়াছে ? বক্তার কথার তাৎপর্য বুঝাইয়া দাও।

১০। (ক) শব্দ-যুগলের অর্থ পার্থক্য বাক্য রচনা করিয়া দেখাও :—

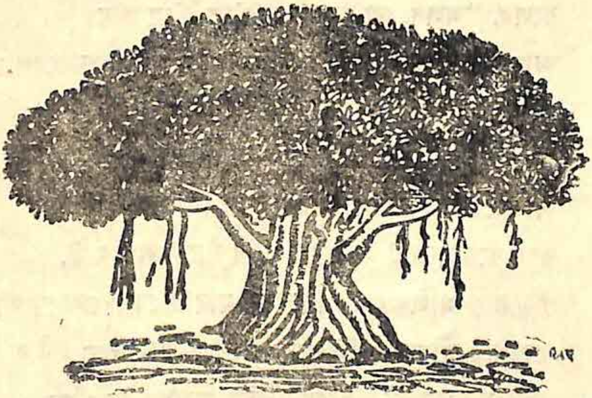
নীর ও নীড়, আকিঞ্চন ও অকিঞ্চন, দিন ও দীন, কীর্তি ও কৃতি, বর্ত্তমান ও বর্ধমান, দারা ও দ্বারা।

(খ) বিপরীত শব্দ লিখ :—

জন্ম, নিশার, সার, অনিত্য, উন্নতি, দুর্লভ, বর্তমান, ক্ষয়।

(গ) গদ্যরূপ লিখ :—

মানব-জনম 'ভুল'নারে, আশ, যাতে, রয়, হেরে, ডেকে, এনে, করহ, সাধন।



জীবন ও সূর্য
কাজী নজরুল ইসলাম



ভোরের বেলায় পূব-গগনে সূর্যি ঠাকুর দেন উঁকি,
বলেন, "অলস, জড়ের মতন ব'সে ব'সে ভাবছ কী ?
আমার আকাশ-মায়ের কোলে জাগি আমি ভোরবেলায়,
আমার হাসির উচ্ছলতা বনে বনে ফুল ফোটায়।
ক্রমেই যত ঊর্ধ্বে উঠি ততই আমি হই প্রখর,
শক্তি-তেজের উজল দ্যুতি ছড়াই বিশ্বভুবন 'পর।
রঙে রঙে রাঙাই আকাশ, যখন সাঁঝে অস্ত যাই,
ত্রিলোক মলিন মোর বিদায়ে, যাবার বেলা দেখতে পাই।
তোমার জীবন এম্‌নি হবে, শৈশবে আনন্দময়,
যেথায় যাবে সেথাই যেন নূতন প্রাণের লহর বয়।
তোমার শক্তি-তপস্যাতে আসবে কাছে ঊর্ধ্বলোক,
তোমার আলোকে ঘুচিয়ে দেবে ত্রিজগতের দুঃখ-শোক।
এই পৃথিবীর আঁধার যত, এই মানুষের সকল ভয়
কর্‌বে মোচন শক্তি দিয়ে, শৌর্য দিয়ে হে দুর্জয়।
দেশের—জাতির লজ্জা, গ্লানি, কলঙ্ক ও অসম্মান
তোমার তেজে দগ্ধ হবে, জাগবে বুকে নূতন প্রাণ।

যে সব আত্ম-বিশ্বাসী ভয়ের গুহায় লুকিয়ে রয়,
তোমার ডাকে আসবে ছুটে হে তেজোবীর, হে দুর্জয়!
যে আদর্শ মানুষ আজও জন্মেনিকো এই ধরায়,
তুমিই হবে সেই সে মানুষ অধ্যবসায়, তপস্যায়।
সূর্য সম শেষ-জীবনে রাঙিয়ে যাবে দিগ্বিদিক
যুক্ত-করে বিশ্ব নিখিল গাইবে তোমার মাঙ্গলিক।
অস্ত গেলে রবি যেমন জগৎ দেখে অন্ধকার,
হারিয়ে তোমায় কাঁদবে শোকে তেমনি মানুষ এই ধরার।"

অনুশীলনী

১। কবিতাটি পড়িয়া কি উপদেশ লাভ করিলে?

২। ব্যাখ্যা কর:—

(ক) তোমার জীবন—লহর বয়

(খ) তোমার শক্তি—হে দুর্জয়।

(গ) যে সব—তপস্যায়

(ঘ) সূর্য সম—এই ধরায়।

অতিরিক্ত অনুশীলনী

৩। "অলস, জড়ের মতন ব'সে ব'সে ভাবছ কী?"
—উক্তিটি কাহার? কোন্ কবিতা হইতে এই পংক্তিটি গৃহীত হইয়াছে? অলস ও জড় কথা দুইটি কাহার উদ্দেশ্যে বলা হইয়াছে?

৪। "আমার আকাশ-মায়ের কোলে জাগি আমি ভোরবেলায়।"
—'আমার'—কাহার? 'আকাশ-মা' কথাটি কেন বলা হইয়াছে? 'আমি' কে? এই আমির আবির্ভাবে কি ঘটে?—কয়েকটি দৃষ্টান্ত দাও।

৫। "তোমার জীবন এম্নি হবে, শৈশবে আনন্দময়—"
তোমার কাহার? কাহার উদ্দেশ্যে কাহার এই উক্তি? আনন্দময় শৈশবের ফলশ্রুতি কি? (বক্তার কথার উত্তর দাও।)

৬। "যুক্ত-করে বিশ্ব নিখিল গাইবে তোমার মাঙ্গলিক।"
—কোন্ কবিতা হইতে এই লাইনটি লওয়া হইয়াছে? কবিতাটি কাহার লেখা? তোমার—কাহার? মাঙ্গলিক কথার অর্থ কি? কেন বিশ্ব নিখিল মাঙ্গলিক গাইবে?

৭। গদ্যরূপ লিখ :—

পূব-গগনে, সূর্যিঠাকুর, উজল, সাঁঝে, ঘুচিয়ে দেবে, জাগবে, লুকিয়ে রয়, জন্মেনিকো, রাঙিয়ে।

৮। শূন্যস্থান পূরণ কর :—

(ক) রঙে — রাঙাই —, যখন — — যাই,
— মলিন — বিদায়ে, — বেলা — পাই।

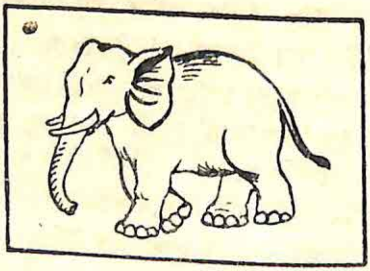
(খ) দেশের — লজ্জা, — — ও —,
তোমার — দগ্ধ —, — বুকে — প্রাণ।

৯। প্রতিটি বন্ধনীতে দুইটি শব্দ আছে—যেইটির বানান শুদ্ধ সেইটি রাখিয়া ভুলটি কাটিয়া দাও।

(সূর্য/সুর্য), (উজ্জল/উজ্জ্বল), (উর্দ্ধ/উর্ধ্ব), (সাঁঝ/সাঁজ), (গুহা/গৃহা)।

১০। পদান্তর কর :—

সূর্য, অলস, তেজ, আলোক, গ্লানি, অসম্মান, অধ্যবসায়, তপস্যা, মাঙ্গলিক।



কিশোর

গোলাম মোস্তাফা

আমরা নূতন আমরা কুঁড়ি নিখিল-মানব নন্দনে,
ওষ্ঠে রাঙা হাসির রেখা জীবন জাগে স্পন্দনে।
লক্ষ আশা অন্তরে ঘুমিয়ে আছে মন্তরে;
ঘুমিয়ে আছে বুকের ভাষা পাপড়ি-পাতার বন্ধনে ॥

সকল কাঁটা ধন্য ক'রে ফুট্‌ব মোরা ফুটব গো!
প্রভাত রবির সোনার আলো দু'হাত দিয়ে লুটব গো!
নিত্য নবীন গৌরবে ছড়িয়ে দিব সৌরভে,
আকাশ পানে তুলব মাথা সকল বাঁধন টুট্‌ব গো!

সাগরজলে পাল উড়িয়ে কেউ বা হব নিরুদ্দেশ,
কলম্বাসের মতন বা কেউ পৌঁছে যাব নূতন দেশ।
জাগবে সারা বিশ্বময়— এই বাঙালী নিঃস্ব নয়,
জ্ঞান-গরিমা শক্তি-সাহস আজও এদের হয়নি শেষ!

কেউ হব সেনানায়ক গড়ব নূতন সৈন্যদল,
সত্য-ন্যায়ের অস্ত্র ধরি, নাই বা থাকুক অন্য বল।
দেশ-মাতারে পূজব গো ব্যথীর ব্যথা বুঝব গো,
ধন্য হবে দেশের মাটি ধন্য হ'বে অন্ন-জল।

জ্ঞানের মূল্য শিখব বলে কেউ বা যাব জার্মানি
সবার আগে চল্‌ব মোরা, সহজে কি হার মানি?
শিল্পকলা শিখব কেউ. গ্রন্থমালা লিখব কেউ,
কেউ বা হব ব্যবসাজীবি, কেউ বা টাটা কার্ণানি।

ভবিষ্যতের লক্ষ্য আশা মোদের মাঝে সন্তরে।
ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুদের অন্তরে।
অবাধ আলোর আমরা পুত, নূতন বাণীর অগ্রদূত,
কত কি যে করব মোরা নাইক তাহার অন্ত রে।

অনুশীলনী

১। কিশোর' কবিতায় কবি যে আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা বলিয়াছেন তাহা সরল ভাষায় লিখ।

২। ব্যাখ্যা কর :—

(ক) সাগর-জলে পাল—হয়নি শেষ।

(খ) জ্ঞানের মূল্য শিখব—টাটা কার্ণানি।

(গ) ভবিষ্যতের লক্ষ আশা—তাহার অন্তরে।

অতিরিক্ত অনুশীলনী

৩। "ঘুমিয়ে আছে বুকের ভাষা পাপড়ি-পাতার বন্ধনে"

—কোন্ কবিতার অন্তর্গত ? কবিতাটি কাহার লেখা ? কোন্ প্রসঙ্গে কবি এই কথা বলিয়াছেন ? বুকের ভাষা কি ? লাইনটির অর্থ নিজের কথায় পরিস্ফুট কর।

৪। "কলম্বাসের মতন বা কেউ পৌছে যাব নূতন দেশ"

কলম্বাস কে ছিলেন ? তিনি কোন্ দেশে পৌচিয়াছিলেন ? নূতন দেশ বলার তাৎপর্য কি ? নতুন নূতন— দুইটি কথাই কি শুদ্ধ ?—যুক্তিসহ উত্তর দাও।

৫। "ধন্য হবে দেশের মাটি ধন্য হবে অন্ন-জল"

—কাহাদের উক্তি ? কি প্রকারে দেশের মাটি ও অন্নজল ধন্য হইবে ? ধন্য—কথার অর্থ কি ?

৬। এক কথায় বল :—

শিল্প গড়ে যে—

গ্রন্থমালা লেখে যে—

ব্যবসা দ্বারা বাঁচে যে—

চিকিৎসা করে যে——।

৭। "ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুদের অন্তরে।"

কথাটি কাহার ? কথাটির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বুঝাইয়া দাও।

৮। শব্দার্থের পার্থক্য দেখাও :—

(কুঁড়ি/কুড়ি) ; (লক্ষ/লক্ষ্য) ; (আশা/আসা) ; (কাঁটা/কাটা)।

৯। গদ্যরূপ লিখ :—

মন্তরে, ঘুমিয়ে আছে, টুটব, লুটব, উড়িয়ে, পূজব, মোদের।

১০। শব্দার্থ লিখ :—

স্পন্দন, নিখিল-মানব-নন্দনে, নিরুদ্দেশ, নিঃস্ব, শিল্পকলা, গ্রন্থমালা, অগ্রদূত।

চরকার গান

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

ভোমরায় গান গায় চরকায়, শোন, ভাই,
খেই নাও, পাঁজ দাও, আমরাও গান গাই।
ঘরবার কারবার দরকার নেই আর,
মন দাও চরকায় আপনার আপনার!

চরকায় ঘর্ঘর পড়শীর ঘর ঘর,
ঘর ঘর ক্ষীর সর আপনার নির্ভর।
পড়শীর কণ্ঠে জাগল সাড়া।
দাঁড়া আপনার পায়ে দাঁড়া।

চরকার সম্পদ, চরকায় অন্ন,
বাঙলার চরকায় ঝলকায় স্বর্ণ।
বাঙলার মস্‌লিন বোগদাদ রোম চীন,
কাঞ্চন তৌলেই কিনতেন একদিন।
চরকায় ঘর্ঘর শ্রেষ্ঠির ঘর ঘর,
ঘর ঘর সম্পদ আপনার নির্ভর
সুপ্তের রাজ্যে দৈবের সাড়া—
দাঁড়া আপনার পায়ে দাঁড়া।

চরকাই লজ্জার সজ্জার বস্ত্র,
চরকাই দৈন্যের সংহার অস্ত্র।
চরকাই সম্ভান, চরকাই সম্মান,
চরকাই দুঃখীর দুঃখের শেষ ত্রাণ।

চরকার ঘর্ঘর বঙ্গের ঘর ঘর,
ঘর ঘর সম্ভ্রম আপনার নির্ভর।
প্রত্যাশ ছাড়বার জাগল সাড়া—
দাঁড়া আপনার পায়ে দাঁড়া।

অনুশীলনী

১। "চরকার গান" কবিতায় কবি তাঁহার দেশবাসী সকলকে চরকা কাটায় মন দিতে অনুরোধ জানাইতেছেন কেন? কারণগুলি এক এক করিয়া উল্লেখ কর।

২। ব্যাখ্যা কর :—

(ক) ঘর বার করবার—আপনার আপনার।

(খ) চরকাই সম্পদ—কিনতেন একদিন।

(গ) চরকাই লজ্জার—দুঃখের শেষ ত্রাণ।

৩। টীকা রচনা কর :—

বাঙলার মসলিন ; চরকাই দৈন্যের সংহার অস্ত্র।

অতিরিক্ত অনুশীলনী

৪। ...আমরাও গান;—আমরা কাহারা? খেই ও পাঁজ কি? তাহা লইয়া কি ধরনের গান? ভ্রমর ও চরকার গানের মিল কোথায়?

৫। "ঘর ঘর ক্ষীর সর আপনার নির্ভর"

—পংক্তিটি কোন্ কবিতার অন্তর্গত? কবিতাটি কাহার লেখা? কোন্ প্রসঙ্গে কবির এই উক্তি? ক্ষীর সর ঘর ঘর কথাটির তাৎপর্য কি?

৬। "বাঙ্‌লার মস্‌লিন বোগদাদ রোম চীন,
কাঞ্চন তৌলেই কিনতেন একদিন"

—মসলিন্ কি? কাঞ্চন তৌল কথাটির অর্থ কি? কোন্ প্রসঙ্গে লেখকের এই উক্তি? পংক্তি দুইটির অর্থ পরিস্ফুট কর।

৭। স্বপ্নের রাজ্যে দৈবের সাড়া—

স্বপ্নের রাজ্য কি ? দৈবের সাড়াই বা কি ? ঐ সাড়ার পরিণতি নির্ধারণ কর।

৮।. "চরকাই দুঃখীর দুঃখের শেষ ত্রাণ।"

—চরকা কি ভাবে দুঃখীর দুঃখ ত্রাণ করে।

৯। (ক) বিপরীত শব্দ লিখ ও বাক্য রচনা কর :—

সুপ্ত, দৈব, সম্মান।

(খ) পদান্তর কর :—

ঘর, নির্ভর, রোম, চীন, দৈন্যের, দৈব, বঙ্গ।

(গ) বন্ধনীর মধ্যের শব্দ দুইটির কোন্‌টী নির্ভুল বল :—

(সম্মান/সন্মান) ; (পড়শী/পরশী) ; (শ্রেষ্ঠী/শ্রেষ্টি) ; (সজ্জার/সজ্জ্যার) ; (সাড়া/শাড়া) ; (দাঁড়াও/দারাও)।

———

মঙ্গলদূত

কালিদাস রায়

গ্রামের প্রান্তে ফেলেছিল তাঁবু বেদে দুই ভাই আসি,
দিনের বেলায় নাচাত ভালুক, রাত্রে বাজাত বাঁশি।
গভীর রাত্রে সহসা ধরিল ওলাওঠা এক ভা'য়
সাথী ভাই গেল ডাক্তার-বাড়ী একলা ফেলিয়া তাঁয়।
ডাক্তার কহে, "রাত্রি দুপুরে কিছুতে পারি না যেতে,
কয় টাকা দিবি ? অগ্রিম চাই," বলে সে হাতটি পেতে।
বেদে কহে কেঁদে "দিতে না পারিব এক টাকা ছাড়া কিছু"
দুয়ার-গোড়ায় রহিল দাঁড়ায়ে মাথাটি করিয়া নিচু।
ডাক্তার কহে, "রাত্রি দুপুরে জ্বালাতে আস্‌লি হেন
অনেক হাতুড়ে রয়েছে বাজারে ডাক দিয়ে নে' না কেন ?"
সাতদিন গত, কেউটিয়া সাপে সেদিন গভীর রাতে
ঐ ডাক্তার-বাবুর ছেলেরে দংশিল ডান হাতে।
পিতার বিদ্যা সবি হ'ল সারা, সবার চেষ্টা শেষ,
দেশের ওঝায় ঘুচাতে নারিল কালের গরললেশ।
নীল হ'য়ে গেল দেহটি তাহার শায়িত তুলসীতলে,
নাড়ীর স্পন্দ হইল বন্ধ, সবে 'হরি' 'হরি' বলে।
হেনকালে সেই বেদে দুইজন উপজিল সেই ঠাঁয়ে,
শেষ চেষ্টাটি করিবে তাহারা কহিল ছেলের মায়ে।
মন্ত্র পড়িল, জলপড়া দিল, আরো কি করিল কত,
ফিরিল জীবন, মেলিল নয়ন, বিষাদ হইল গত।
ডাক্তার কেঁদে জোড় হাতে কয়, "যাহা চাও তাই দিব
সন্তানে মোর দিয়েছ জীবন চরণের ধূলি নিব।"
বেদে কহে, "বাবু, লভ মঙ্গল সুমতি তোমার হোক্,
কিছুই নিব না, এমনি করিয়া ঘুরি মোরা তিন লোক।

মোরা বিধাতার মঙ্গল দূত বেদে বেশে ফিরি দোঁহে,
ভ্রান্ত অন্ধে দেখায়ে পন্থা চেতনা বিতরি মোহে।
বিপদে পড়িয়া ছল করে ডাকি, না ডাকিতে করি ত্রাণ,
জীবজগতের ধ্রুবমঙ্গল শুভ ফল করি দান।"
এত কহি সেই দুই ভবঘুরে আঁধারে মিলাল ছলি,'
নির্বাক্ সবে, আঁখি পালটিতে কোন দিকে গেল চলি'।

অনুশীলনী

১। এই কবিতায় কবি কাহাকে মঙ্গলদূত বলিয়াছেন এবং কেন বলিয়াছেন ?

২। এই কবিতায় বর্ণিত গল্পটি নিজের ভাষায় লিখ।

৩। ব্যাখ্যা লিখ :— ভ্রান্ত অন্ধে——বিতরি মোহে।

অতিরিক্ত অনুশীলনী

৪। "কয় টাকা দিবি ? অগ্রিম চাই" বলে সে হাতটি পেতে।"

—সে কে ? অগ্রিম কেন চাহিল ? কাহার কাছে চাহিল ? কি কারণেই বা বেদে আসিয়াছিল ?

৫। "দেশের ওঝায় ঘুচাতে নারিল কালের গরল লেশ"

—কোন্ কবিতা হইতে গৃহীত ? কোন্ প্রসঙ্গে কবি এই উক্তি করিয়াছেন ? কালের কথাটার অর্থ কি ?

৬। "ভ্রান্ত অন্ধে দেখায়ে পন্থা চেতনা বিতরি মোহে।"

—পংক্তিটি কোথা হইতে গৃহীত ? প্রসঙ্গ নির্দেশপূর্বক অর্থ পরিস্ফুট কর।

৭। (ক) গদ্যরূপ লিখ :

তাঁ'য়, দংশিল, নারিল, উপজিল, মোর, বিতরি, ছলি।

(খ) বিপরীত শব্দ লিখ :—

ক্লান্ত, নিচু, গভীর, শেষ, বিপদ, মঙ্গল, শুভ।

নইলে

অজিত দত্ত

প্যাঁচ কিছু জানা আছে কুস্তির ?
ঝুলে কি থাকতে পার সুস্থির ?
নইলে
রইলে
ট্রাম না চ'ড়ে—
ভ্যাবাচাকা রাস্তায় প'ড়ে বেঘোরে।
প্র্যাকটিস করেছ কি দৌড়ে ?
লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে আর ভোঁ-উড়ে ?
নইলে
রইলে
লরিতে চাপা,
তাড়া করে বাড়ি থেকে বাড়িয়ো না পা।
দাঁত আছে মজবুত সব বেশ ?
পাথর চিবিয়ে আছে অভ্যেস ?
নইলে
রইলে
ভাত না খেয়ে,
চালে ও কাঁকরে আধাআধি থাকে হে।
স্থির ক'রে পা দুটো ও মনটা,
দাঁড়াতে পার তো বারো ঘণ্টা
নইলে
রইলে
না কিনে ধুতি
যতই দোকানে গিয়ে কর কাকুতি।

অনুশীলনী

১। 'নইলে' কবিতায় কবি মানুষকে অনুশীলন করার জন্য কি সংকেত দিয়াছেন ?

২। কবিতাটির সংক্ষিপ্তসার লিখ।

অতিরিক্ত অনুশীলনী

৩। "ট্রাম না-চ'ড়ে—
ভ্যাবাচাকা রাস্তায় প'ড়ে বেঘোরে"

—কাহার কখন এই অবস্থা হয় ? কে, কোথায় এই কথা বলিয়াছিলেন ?

৪। "রইলে—
ভাত না খেয়ে,
চাল ও কাঁকরে আধাআধি থাকে হে।"

—কোথা হইতে লওয়া হইয়াছে ? কাহার উক্তি ? ভাত না খাইয়া থাকার কারণ কি ? ঐ অবস্থার প্রতিকারই বা কি ?

৫। শব্দার্থ লিখ :

প্যাঁচ, সুস্থির, ভ্যাবাচাকা, ফাঁপরে, মজবুত, কাঁকর, কাকুতি।

৬। বাক্য গঠন কর :—

নইলে, বেঘোরে, অভ্যাস, আধাআধি।

৭। পদান্তর কর :

স্থান, দাঁত, অভ্যাস, স্থির।
